জামায়াতে ইসলামীর ইতিহাস

আব্বাস আলী খান

জামায়াতে ইসলামীর ইতিহাস

সংক্ষিপ্ত

আব্বাস আলী খান

শতাব্দী প্রকাশনী
ফোন : ৮৩১১২৯২, মোবাইল : ০১৭৫৩৪২২২৯৬
E-mail: shotabdipro@yahoo.com

জামায়াতে ইসলামীর ইতিহাস (সংক্ষিপ্ত)

আব্বাস আলী খান

ISBN : 984-645-050-x

শ প্র : ৫৬

প্রকাশক

শতাব্দী প্রকাশনী

৪৯১/১ মগবাজার ওয়ারলেস্ রেলগেইট, ঢাকা-১২১৭

ফোন : ৮৩১১২৯২, মোবা : ০১৭৫৩৪২২২৯৬

ই-মেইল : shotabdipro@yahoo.com.

পঞ্চম মুদ্রণ : মার্চ ২০১১ ঈসায়ী

কম্পোজ

এ জেড কম্পিউটার এন্ড প্রিন্টার্স

মুদ্রণ

আল ফালাহ্ প্রিন্টিং প্রেস

৪২৩, বড় মগবাজার, ঢাকা- ১২১৭

মূল্য : ৪৫.০০ টাকা মাত্র

শতাব্দী প্রকাশনী

JAMAAT-E-ISLAMIR ETIHASH by Abbas Ali Khan, Published by Shotabdi prokashoni, 491/1 Moghbazar Wireless Railgate, Dhaka-1217, Phone : 8311292, Mob : 01753422296, E-mail: shotabdipro@yahoo.com.

5th Print : March 2011.

Price : Tk. 45.00 only.

সূচিপত্র

■ জামায়াতে ইসলামীর ইতিহাস ৭
- জামায়াতে ইসলামী কি ? ৭
- ইসলামী আন্দোলনের সূচনা ৭
- খুলাফায়ে রাশেদীনের ইসলামী আন্দোলন ৮
- খুলাফায়ে রাশেদীনের পর ইসলামী আন্দোলন ৮
- ভারতে ইসলামী আন্দোলন ৮
- সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদীর সংক্ষিপ্ত পরিচয় ১০
- আল জিহাদ ফিল্ ইসলাম ১২
- গবেষণা ও ইসলামী আন্দোলনের প্রস্তুতি স্তর ১৫
- তৎকালীন ভারতে মুসলমানদের অবস্থা ১৬
- তর্জুমানুল কুরআনের মাধ্যমে ইসলামী আন্দোলন ১৭
- দারুল ইসলাম ট্রাস্ট গঠন ও ইসলামী আন্দোলনের লক্ষ্যে দল গঠনের পটভূমিকা রচনা ২১

■ দারুল ইসলামের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ছিলো নিম্নরূপ ঃ ২১
- শাসনতান্ত্রিক প্রস্তাব ২৩
- প্রকৃতপক্ষে ২৪
- প্রথম প্রস্তাব ২৪
- দ্বিতীয় প্রস্তাব ২৪
- তৃতীয় প্রস্তাব ২৪

■ জামায়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠা ২৭
- জামায়াতে ইসলামীর কাজ ৩৪
- জামায়াতের গঠনতন্ত্রের অনুমোদন ৩৬

■ জামায়াতে ইসলামীর দাওয়াত ৪১
- আমীরে জামায়াতের সাংগঠনিক ও দাওয়াতী সফর ৪২
- জামায়াত দপ্তর স্থানান্তর ৪৩
- মাওলানার বিশেষ হিদায়াত ৪৩

- ◆ মাওলানার অসাধারণ কর্মব্যস্ত জীবন ৪৪
- ◆ মজলিসে শূরার জরুরী বৈঠক ৪৫
- ◆ জামায়াতের প্রাথমিক সাংগঠনিক স্তর ৪৬
- ◆ সেক্রেটারী জেনারেল [কাইয়েম] ৪৬
- ◆ প্রথম নিখিল ভারত জামায়াতে ইসলামী রুকন সম্মেলন ৪৭
- ◆ দ্বিতীয় নিখিল ভারত সম্মেলন [১৯৪৬] ৪৭
- ◆ পাটনা সম্মেলন [১৯৪৭] ৪৭
- ◆ জামায়াতের সাহিত্য সৃষ্টি ৪৮
- ◆ ভারত বিভাগ ৫০
- ◆ দেশ বিভাগের সময় দারুল ইসলাম ৫০
- ◆ জামায়াতে ইসলামী দুই ভাগে বিভক্ত ৫০
- ◆ ৬ই জানুয়ারী ১৯৪৮ ৫২
- ◆ মাওলানার গ্রেফতারী ৫২
- ◆ আদর্শ প্রস্তাব ১২ই মার্চ ১৯৪৯ ৫২
- ◆ মুক্তিলাভ ৫৩
- ◆ আলেমগণের ২২ দফা ৫৪
- ◆ ১৯৫৩ সাল ৫৪
- ◆ ডাইরেক্ট অ্যাকশন ঘোষণা ৫৪
- ◆ মাওলানার প্রতি মৃত্যুদন্ডাদেশ ৫৫
- ◆ পূর্ব পাকিস্তান জামায়াতে ইসলামী ও মাওলানা মওদূদীর সফর ৫৫
- ◆ মাওলানার দ্বিতীয়বার পূর্ব পাকিস্তান সফর ৬১
- ◆ নিখিল পাক জামায়াতে ইসলামী সম্মেলন [১৯৪৯-৬৩] ৬৩
- ◆ একাত্তুরের ভূমিকা ৬৪

■ **জামায়াতে ইসলামীর বৈশিষ্ট্য** ৬৮

■ **পরিশিষ্ট** ৭৪

■ **জামায়াত প্রতিষ্ঠাতার কিছু মূল্যবান কথা** ৭৬

- ◆ দল গঠনের আবশ্যকতা ৭৬
- ◆ তাবলীগ ও বিপ্লব ৭৭
- ◆ ইকামতে দীন একটি অটল ও অপরিহার্য কর্তব্য ৭৭
- ◆ হুকুমতে ইলাহীয়া ও আল্লাহর সন্তুষ্টি ৭৮
- ◆ সত্য পথের দাবী ৭৯
- ◆ গ্রন্থ পঞ্জী ৮০

গ্রন্থকারের কথা

জামায়াতে ইসলামী তথা বিংশ শতাব্দীর ইসলামী আন্দোলনের অন্যতম ও উল্লেখযোগ্য সংগঠনের বিস্তারিত ইতিহাস রচনা করা বড়ো কঠিন ও সময়সাপেক্ষ কাজ। জামায়াতে ইসলামীর প্রতিদিনের কাজ ও প্রতিটি পদক্ষেপ লিপিবদ্ধ হওয়ার যোগ্য। তাই তার বিস্তারিত ও পুংখানুপুংখ ইতিহাস কয়েক খন্ডে পরিণত হবে। তেমন ইতিহাস লেখার দুঃসাহস না থাকলেও এ দায়িত্ব আমার উপর অর্পিত হয়। কারণ জামায়াতে ইসলামীর অধীনে ইসলামী আন্দোলনকারী প্রতিটি কর্মীর জামায়াতের ইতিহাস জানার একান্ত প্রয়োজন আছে। এ জামায়াতটির সত্যিকার পরিচয় কি, তা গঠনের প্রয়োজনীয়তা কি ছিলো? কি তার পটভূমি, ভারতীয় মুসলমানদের কোন জীবন-মরণ সন্ধিক্ষণে এ জামায়াতের প্রতিষ্ঠা, আম্বিয়ায়ে কেরামের আন্দোলনের সাথে কি এর সম্পর্ক, দুনিয়ার অন্যান্য আন্দোলনের ও দলের এবং জামায়াতে ইসলামীর পার্থক্য কি, এ আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা কে এবং কি তাঁর পরিচয়? -এমনি প্রতিটি বিষয় সম্পর্কে জানবার কৌতুহল ও অনুসন্ধিৎসা, জামায়াত কর্মী কেন অন্যান্যেরও থাকা স্বাভাবিক।

গত বছর ১৪ই অক্টোবর থেকে চার দিনব্যাপী ঢাকায় অনুষ্ঠিত জামায়াতের রুকন সম্মেলনে জামায়াতে ইসলামীর লিখিত ইতিহাস পাঠ করার দায়িত্ব আমার উপর অর্পিত হয়। প্রায় ষাট বছরের ইতিহাস কতো সংক্ষিপ্ত করলে একটা সম্মেলনে পাঠ করা যায়- তা পাঠকমাত্রই অনুধাবন করতে পারেন। যাই হোক, তড়িঘড়ি একটা লিখে ফেলা হয় এবং সম্মেলনে তা কাটছাঁট করে পড়া হয়। কিন্তু সম্মেলনে এবং তার পরে ইতিহাস গ্রন্থাকারে প্রকাশ করার দাবী আসতে থাকে।

সেসব দাবীর প্রেক্ষিতে এবং ইতিহাসের প্রয়োজনীয়তাকে সামনে রেখে বইখানি প্রকাশ করার সিদ্ধান্ত করা হয়। অবশেষে সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী রিসার্চ একাডেমী ঢাকা-এর পক্ষ থেকে বইখানি প্রকাশনার ব্যবস্থা করা হয়।

সাধারণ পাঠক সমাজ এবং বিশেষ করে শ্রদ্ধেয় আলেম সমাজের প্রতি আবেদন, তাঁরা যেন নিরপেক্ষ মন ও দৃষ্টিভংগিসহ বইখানা আগাগোড়া পড়ে দেখেন। পূর্বের কোন বদ্ধমূল ধারণা, কোনো কুসংস্কার, কোনো ভিত্তিহীন প্রচারণা, ব্যক্তির প্রতি সীমাহীন শ্রদ্ধা-ভালোবাসা ইসলামের দৃষ্টিকোণ থেকে পরিত্যাজ্য। কারণ এসব কিছু সত্যকে উপলব্ধি ও গ্রহণ করার পথে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়। খোদার ভয় এবং আখেরাতে তাঁর দরবারে জবাবদিহির অনুভূতিই সত্যকে সর্বাগ্রে সত্য বলে গ্রহণ করার প্রেরণা জন্মায়। এই অনুভূতিই যেমন গ্রন্থ রচনায় প্রেরণা জুগিয়েছে, তেমনি এই অনুভূতিই পাঠকের মধ্যে জাগ্রত হবে বলেই একান্তভাবে আশা করি। ইসলামী আন্দোলনের গুরুদায়িত্ব ছিলো মূলতঃ আম্বিয়ায়ে কেরাম আলাইহিমুস সালামের উপর এবং আখেরী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পর এ দায়িত্ব প্রধানতঃ ওলামায়ে কেরামের উপর। যাঁদেরকে নবী পাকের সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নৈতিক উত্তরাধিকারী বলা হয়েছে। তাই উম্মতে মুসলিমা এ আন্দোলনে ওলামায়ে কেরামকেই প্রথম সারিতে দেখতে আগ্রহী। আশা করি এ সংক্ষিপ্ত ইতিহাস তাঁদের মধ্যেও ইসলামী আন্দোলনের কর্মচাঞ্চল্য সৃষ্টি করবে।

সর্বশেষে রাব্বুল আলামীনের দরবারে, যাঁর বিশেষ রহমতের উপরেই আমাদের পরকালীন জীবনের কল্যাণ একান্তভাবে নির্ভরশীল, এ দোয়া করি যে, তিনি যেন এ ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি কবুল করেন এবং পাঠকবৃন্দকে ইসলামী আন্দোলনে অনুপ্রাণিত করেন, আমীন।

আগামী সংস্করণে ইতিহাসের কলেবর বর্ধিত হবে। ইনশাআল্লাহ্।

বিনীত

গ্রন্থকার

জামায়াতে ইসলামীর ইতিহাস

জামায়াতে ইসলামী কি?

আল্লাহ তায়ালার যমীনে আল্লাহ তায়ালার পূর্ণাংগ দীন পরিপূর্ণরূপে কায়েম করার লক্ষ্যে আন্দোলন, চেষ্টা-চরিত্র, সাধনা ও সংগ্রাম করার যে জামায়াত বা দল তাই জামায়াতে ইসলামী। অতএব জামায়াতে ইসলামী একটি পূর্ণাংগ ইসলামী আন্দোলন। বাতিল মতবাদ, চিন্তাধারা ও জীবনবিধান খন্ডন করে এবং তার অন্তঃ সারশূণ্যতা ও অনিষ্টকারীতা প্রতিপন্ন করে তার পরিবর্তে মানব জাতির জন্যে আল্লাহর দেয়া একমাত্র মংগলকর জীবনবিধান প্রতিষ্ঠার আন্দোলনই ইসলামী আন্দোলন।

ইসলামী আন্দোলনের সূচনা

মানব জাতির জন্মলগ্ন থেকেই ইসলামী আন্দোলনের সুচনা। তাই মানব জাতির ইতিহাস যতো প্রাচীন ইসলামী আন্দোলনের ইতিহাসও ততোটা প্রাচীন। ইসলামী আন্দোলন কোনোকালের কোনো এক সময়ে হঠাৎ করে গজে ওঠা কোনো অভিনব বস্তু নয়। বরঞ্চ আবহমানকাল থেকে চলে আসা এক নিরবচ্ছিন্ন ধারাবাহিকতার সুদৃঢ় সূত্রে এ বাঁধা। অতীতের ধারাবাহিকতা থেকে একে বিচ্ছিন্ন করে দেখলে চলবেনা। মূলতঃ এ আন্দোলনের ধারক ও বাহক ছিলেন আল্লাহ তায়ালার প্রিয় নবীগণ। আদি মানব হযরত আদম [আ] থেকে আরম্ভ করে শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা [স] পর্যন্ত লক্ষ লক্ষ নবী এ আন্দোলন করেছেন এবং এ উদ্দেশ্যেই তাঁরা দুনিয়ার বুকে প্রেরিত হয়েছিলেন।

খুলাফায়ে রাশেদীনের ইসলামী আন্দোলন

দীন প্রতিষ্ঠার আন্দোলন যেমন ইসলামী আন্দোলন, তেমনি দীন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর বাতিল শক্তি ও চিন্তাধারার আকীদাহ-বিশ্বাস ও

আমল আখলাকের প্রভাব থেকে তাকে অক্ষুন্ন, অমলিন ও অবিকৃত রাখার চেষ্টা-সাধনাও ইসলামী আন্দোলন। নবী মুস্তাফা [স] এর প্রতিষ্ঠিত দীন তথা ইসলামী ব্যবস্থাকে অমলিন ও অবিকৃত রাখার সংগ্রাম সাধনাই করেছেন তাঁর সুযোগ্য ও মহান উত্তরসূরী খুলাফায়ে রাশেদীন [রা]।

খুলাফায়ে রাশেদীনের পর ইসলামী আন্দোলন

আগেই বলেছি আল্লাহর প্রিয় নবীগণই ছিলেন ইসলামী আন্দোলনের ধারক, বাহক, প্রতিষ্ঠাতা ও নেতা। কিন্তু তাই বলে সর্বশেষ নবীর তিরোধানের পর ইসলামী আন্দোলন বন্ধ ও স্তব্ধ হয়ে যায়নি। নবী মুস্তাফার [স] পর এ আন্দোলনের গুরুদায়িত্ব অর্পিত হয় উম্মাতে মুসলিমার উপর এবং এ ধারা চলতেই থাকবে যতোদিন দুনিয়ার বুকে মানব জাতির অস্তিত্ব বিদ্যমান থাকবে। তাই আখেরী নবীর পর খুলাফায়ে রাশেদীন এবং তাঁদের পরে হযরত হুসাইন শহীদ [রা], হযরত ওমর বিন আব্দুল আযীয [রা] হযরত ইমাম আবু হানিফা [রঃ], ইমাম মালেক [র] ইমাম আহমদ বিন হাম্বল [র] ইমাম গাযযালী [র] ইমাম ইবনে তাইমিয়া [র] প্রমুখ ইসলামের মহান মনীষীগণ এ আন্দোলন পরিচালনা করেন।

ভারতে ইসলামী আন্দোলন

উল্লেখ্য যে খিলাফতে রাশেদার পর রাজতন্ত্র কায়েম হলেও মুসলিম শাসিত দেশগুলোতে আইনের উৎস ছিলো কুরআন ও সুন্নাহ এবং প্রচলিত ছিলো ইসলামী আইন। হযরত উমর বিন আব্দুল আযীয [রা] তাঁর শাসনকালে গোটা শাসন ব্যবস্থাকে খিলাফতে রাশেদার রূপদান করেছিলেন। তাঁর পরেও উমাইয়া ও আব্বাসীয়া শাসনামলেও দেশে ইসলামী আইন প্রচলিত ছিলো। কারণ তৌহীদে বিশ্বাসী মুসলমান আল্লাহর আইনের পরিবর্তে মানব রচিত আইন কিছুতেই বরদাশত করতে রাজী ছিলোনা। অবশ্যি অনেক শাসক নিজেদের জীবনে পুরোপুরি ইসলামকে মেনে চলেননি।

ভারতবর্ষে মুসলিম শাসন আমলেও দেশে ইসলামী আইন প্রচলিত ছিলো। সম্রাট আকবর মুসলিম আইন উচ্ছেদ করে দীনে ইলাহী নামে এক উদ্ভট ধর্ম প্রবর্তনের চেষ্টা করেন। উদ্দেশ্য ছিলো ইসলাম ও ইসলামী আইন দেশের বুক থেকে নির্মূল করা। কিছু সংখ্যক স্বার্থপূজারী আলেম আকবরের এ উদ্ভট কল্পনা বিলাসকে কার্যকর করার জন্যে প্রত্যক্ষ সাহায্য সহযোগিতা করেন। অপরদিকে অমুসলিম পন্ডিত ও পরিষদবৃন্দ আকবরকে এ ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রের প্রেরণা দান করেন। ইসলাম ও মুসলমানের এ চরম সংকট সন্ধিক্ষণে ইসলামী আন্দোলনের হাতিয়ার নিয়ে মাঠে নামেন এক মর্দে মুজাহিদ হযরত শায়েখ আহমদ ফারুকী সিরহান্দী মুজাদ্দেদে আল্‌ফেসানী [র]। আকবরের পর দীনে ইলাহীর ভক্ত-অনুরক্ত তাঁর পুত্র জাহাঙ্গীর মুজাদ্দিদে আল্‌ফেসানীকে গোয়ালিয়ার দূর্গে বন্দী করে তাঁর সমগ্র রাজশক্তি দিয়েও দীনে ইলাহীকে তার অপমৃত্যু থেকে বাঁচাতে পারেননি।

মোগল সাম্রাজ্যের পতন যুগে শাহ অলী উল্লাহ মুহাদ্দিস্ দিহ্‌লাভী [র] লেখনীর মাধ্যমে ইসলামী আন্দোলন শুরু করেন। শাসক, আলেম সমাজ, পীর বুযর্গ ও মুসলিম জনসাধারণের চিন্তাধারা ও আমল আখলাকে যে বিকৃতি এসেছিলো। তাঁর ক্ষুরধার লেখনীর মাধ্যমে সেসবের পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ করে তা খন্ডন করেন এবং সংস্কার সংশোধনের জন্যে জাতির মধ্যে দুর্বার প্রেরণা সঞ্চার করেন। কর্মক্ষেত্রে প্রত্যক্ষভাবে তিনি ইসলামী আন্দোলন না করলেও তিনি ইসলামী চিন্তাধারার বিপ্লব সাধন করেন। ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থা ও তার রূপরেখা তুলে ধরেন।

পরবর্তীকালে তাঁর এ চিন্তাধারাকে বাস্তবেরূপ দেয়ার জন্যে সাইয়েদ আহমদ শহীদ ও শাহ ইসমাঈল শহীদের নেতৃত্বে তাহ্‌রিকে মুজাহেদীন নামে এক সশস্ত্র আন্দোলন শুরু হয় এবং উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে এক পূর্ণাংগ ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম হয়। ভারতের সকল অঞ্চল থেকে অসংখ্য মুজাহেদীন এ সশস্ত্র আন্দোলনে শরীক হন। তাঁদের দিন কাটতো অশ্বপৃষ্ঠে রণসাজে সজ্জিত অবস্থায়। রাত কাটতো জায়নামাযে ঠিক সাহাবায়ে

কেরামের অনুসরণে। কিন্তু কতিপয় মুনাফিক ও বিশ্বাসঘাতক মুসলমানের সহায়তায় ১৮৩১ সালে বালাকোট প্রান্তরে হক ও বাতিলের যে রক্তাক্ত সংঘর্ষ হয়, তাতে সাইয়েদ আহমদ ব্রেলভী ও শাহ ইসমাঈল শহীদসহ বহু মুজাহেদীন শাহাদত বরণ করেন এবং ইসলামী রাষ্ট্র ও আন্দোলনের সাময়িক পতন ঘটে। কিন্তু তার পরেও ইসলামী আন্দোলনের দুর্বার প্রেরণা ভস্মাচ্ছাদিত আগুনের মতো মুসলমানদের বুকে বিদ্যমান থাকে যা মাঝে মাঝে বিস্ফূরিত হতে দেখা যায়।

বালাকোট ট্রাজেডীর একশ' বছর পর ইং ১৯৩১ সালে বৃটিশ ভারতে নতুন করে আবার ইসলামী আন্দোলন শুরু হয়। এ আন্দোলনের সূচনা করেন আটাশ বছর বয়স্ক এক যুবক সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী।

সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদীর সংক্ষিপ্ত পরিচয়।

কোনো আন্দোলন এবং তার প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালককে পৃথকভাবে চিন্তা করা যায়না। কোনো কালে যুগে কোথাও কোনো ব্যক্তি ইসলামী আন্দোলনের তথ্য ইসলামী বিপ্লবের দাওয়াত পেশ করলে স্বভাবতঃই লোক জানতে চায় লোকটি কে ও কেমন? কি তাঁর বংশ পরিচয়, তাঁর শিক্ষা দীক্ষা, স্বভাব চরিত্র। তাঁর বুদ্ধিমত্তাই বা কেমন? তাঁর কথা ও কাজের মধ্যে কোনো সামঞ্জস্য আছে কি-না এবং তাঁর কথাগুলো যুক্তিসঙ্গত ও গঠনমূলক কি-না? সেজন্যে মনে করি আন্দোলনের ইতিহাস আলোচনার আগে তার প্রতিষ্ঠাতা সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা থাকা প্রয়োজন। তাই সংক্ষেপে তাঁর পরিচয় পেশ করছি।

সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী আহলে বায়ত অর্থাৎ নবী বংশে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর ঊর্ধমুখী বংশ পরম্পরা হযরত নকীর [র] মাধ্যমে নবী মুস্তফার [স] কলিজার টুকরো, হযরত ইমাম হুসাইন শহীদ [রা] পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছেছে। তাঁর পিতা-পিতামহ ও পূর্ব-পুরুষগণের সকলেই ইসলামী দাওয়াত ও তাবলীগ এবং দীনী শিক্ষা-দীক্ষা প্রভৃতি কাজেই জীবন অতিবাহিত করেন। হযরত খাজা কুতুবুদ্দীন মওদূদ চিশ্তী [র] ভারতীয় চিশ্তীয়া তরিকার পীরগণের আদি পীর ছিলেন। তাঁর নামেই মওদূদী

খান্দানের উদ্ভব হয়েছে। সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদীর উর্ধতন বাইশ পুরুষ সকলেই কুতুবুদ্দীন মওদূদ চিশ্তীর নামানুসারে নিজেরদেরকে মওদূদী নামে অভিহিত করেন।

ইংরেজী ১৯০৩ সালে হায়দারাবাদের আওরংগবাদ শহরে সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী জন্ম গ্রহণ করেন। বাড়িতে গৃহ শিক্ষকের কাছে তাঁর শিশু শিক্ষা শুরু হয়। তার পিতা সাইয়েদ আহমদ হাসান মওদূদী ছিলেন একজন আবেদ ও পরহেযগার বুযর্গ। তিনি আদর্শ পিতা হিসেবে পুত্র মওদূদীকে ইসলামের ছাঁচে গড়ে তুলেন। চার বছর বয়সেই শিশু আবুল আ'লা পিতার সাথে পাঁচ ওয়াক্ত মসজিদে গিয়ে জামায়াতসহ নামাযে অভ্যস্থ হন। পাঁচ বছর বয়সে কুরআন পাকের তিরিশটি আয়াত অর্থসহ মুখস্ত করেন। অত অল্প বয়সেই কুরআন হাদীস, ফেকাহ্র বিভিন্ন কিতাব, আরবী সাহিত্য প্রভৃতি পাঠ করেন। এগারো বছর বয়সে আওরঙ্গবাদের একটি স্কুলের অষ্টম শ্রেণীতে তাঁকে ভর্তি করে দেয়া হয়।

সে সময় আল্লামা শিবলী নোমানীর পরিকল্পনা অনুযায়ী হায়দরাবাদ ও আওরংগাবাদে এক নতুন ধরনের শিক্ষা ব্যবস্থা কায়েম হয়। শিক্ষার মাধ্যম ছিলো উর্দূ, ইতিহাস, ভূগোল, অংক ও আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাথে আরবী সাহিত্য, ব্যাকরণ, কুরআন, হাদীস, ফেকাহ্, মানতেক প্রভৃতি পড়ানো হতো। এ মানের ম্যাট্রিকুলেশনকে মৌলভী, ইন্টারমিডিয়েটকে মৌলভী আলেম এবং ডিগ্রী কলেজকে দারুল উলূম বলা হতো।

চৌদ্দ বছর বয়সে মৌলভী বা ম্যাট্রিক পাশ করার পর পিতা তাঁকে হায়দরাবাদ দারুল উলুমে ভর্তি করেন। ছ'মাস পর পিতা অসুস্থ হয়ে ভূপাল যান। তাঁর চিকিৎসা ও সেবা-শুশ্রুষার জন্যে আবুল আ'লা মওদূদীকে পড়াশুনা ছেড়ে ভূপাল যেতে হয়। ১৯২০ সালে পিতার ইন্তিকাল পর্যন্ত তাঁকে পিতারই খেদমত করতে হয়। ফলে তাঁর উচ্চ শিক্ষা অসমাপ্ত রয়ে যায়। পিতার মৃত্যুর পর সতেরো বছর বয়স্ক বালক মওদূদীকে জীবিকার জন্যে সাংবাদিকতার পেশা গ্রহণ করতে হয়। আল্লাহ তায়ালা দিয়েছিলেন তাঁকে অসাধারণ প্রতিভা। যার বলে তিনি জব্বলপুরে 'তাজ' নামক একটি

সাপ্তাহিক পত্রিকার সম্পদনা ভার গ্রহণ করেন। পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর তিনি দিল্লী যান এবং জমিয়তে ওলামায়ে হিন্দের মুখপত্র 'মুসলিম' এবং পরবর্তীকালে 'আল-জমিয়তের' সম্পাদনা ভার গ্রহণ করেন।

এ সময়ে তিনি ইংরেজী ভাষা মাত্র ছ'মাসের মধ্যে এতোটা আয়ত্ব করেন যে, যে কোনো ইংরেজী বই পড়ে বুঝতে পারতেন। তিনি তিনখানি ইংরেজী বইয়েরও উর্দূ তরজমা করেন। অবসর সময় তিনি তিনজন প্রখ্যাত আলেমে দীনের কাছে আরবী সাহিত্য, হাদীস, তফসীর ফেকাহ প্রভৃতিতে গভীর জ্ঞান লাভ করেন।

মওলানা আব্দুস সাত্তার নিয়াযী ছিলেন তৎকালীন অন্যতম শ্রেষ্ঠ আলেমে দীন কুরআন, হাদীসে ও আরবী ভাষার যাঁর গভীর জ্ঞান-গরিমা চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছিলো। যিনি আমল আখলাকে ছিলেন একেবারে দরবেশ। সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী তাঁর কাছে প্রতিদিন ফজর নামাযের পূর্বে ঘন্টা খানেক আরবী ব্যাকরণ সর্ফ, নুহ, মাকুলাত, মায়ানী ও বালাগাত শিক্ষা লাভ করেন। মাওলানা আশ্ফাকুর রহমান সাহেবের নিকট হাদীসের দাওরা শেষ করেন। উপরুন্ত মাওলানা শরীফুল্লাহ সাহেবের নিকট তফ্সীরে বয়যাক, হেদায়া মুতাওয়াল অর্থাৎ এলমে মায়ানী ও বালাগাত শিক্ষা লাভ করেন। তিরমিযি ও মুয়াত্তা হাদীস গ্রন্থগুলোরও পুরোপুরি সবক তাঁর কাছে গ্রহণ করেন। এভাবে সাত-আট বছর দিল্লী অবস্থান কালে সাইয়েদ মওদূদী তাঁর অসমাপ্ত শিক্ষা সম্পূর্ণ করেন এবং আরবী ভাষা, হাদীস, তাফ্সীর ও ফেকাহ্ প্রভৃতিতে গভীর পান্ডিত্য লাভ করেন।

আল জিহাদ ফিল ইসলাম

ইংরেজী উনিশ শ' ছাব্বিশ সনে ভারতবর্ষে একটি দুঃখজনক ঘটনা ঘটে। স্বামী শ্রদ্ধানন্দ শুদ্ধি আন্দোলনের মাধ্যমে ভারতের অজ্ঞ দরিদ্র ও অশিক্ষিত মুসলমানদেরকে হিন্দু ধর্মে দীক্ষিত করার এক অভিযান শুরু করে। যার প্রতিক্রিয়া স্বরূপ জনৈক মুসলমান যুবক শ্রদ্ধানন্দকে হত্যা করেন। ফলে সারা ভারতে সাম্প্রদায়িক হাংগামার দাবানল প্রজ্জ্বলিত হয়। হিন্দু সাম্প্রদায়ের লোকের দ্বারা যেখানে সেখানে মুসলিম বস্তিসমূহ আক্রান্ত

হতে থাকে। মুসলমানদের জান-মাল, ইজ্জত, আব্রু লুণ্ঠিত হতে থাকে। হিন্দু নেতৃবৃন্দও বক্তৃতা-বিবৃতির মাধ্যমে সকল দোষ মুসলমানদের ঘাড়ে চাপাতে থাকে। শুধু তাই নয়, ইসলাম ও ইসলামী জিহাদের অপব্যাখ্যা ও অপ-প্রচার দ্বারা ভারতের সর্বত্র চরম উত্তেজনা সৃষ্টি করতে থাকেন। স্বয়ং মিঃ গান্ধীও এ অপ-প্রচারে অংশ গ্রহণ করেন। এসব অপ-প্রচারের জবাব দেয়ার দায়িত্ব ছিলো আলেম সমাজের। কিন্তু তৎকালে ভারতীয় আলেমগণের একমাত্র সংগঠন জমিয়তে ওলামায়ে হিন্দ এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ নীরবতা অবলম্বন করে। মুসলিম মিল্লাতের ইসলাম দরদী সিংহপুরুষ মাওলানা মুহাম্মদ আলী জওহর-প্রায় প্রতিদিন দিল্লী জামে মসজিদে জিহাদের উপর বক্তৃতা করতে গিয়ে কেঁদে বুক ভাসাতেন এবং শ্রোতাদেরকেও কাঁদাতেন। একদিনের বক্তৃতায় তিনি অত্যন্ত দুঃখ ভারাক্রান্ত হৃদয়ে বলেন, "হায় আজ যদি ভারতের বুকে এমন কোনো আলেমে দীন থাকতেন যিনি হিন্দুদের এসব অপ-প্রচারের দাঁতভাঙ্গা জবাব দিতেন।"

উক্ত সভায় শ্রোতা হিসেবে বসেছিলেন তেইশ বছরের যুবক ও 'আল জমিয়ত' পত্রিকার সম্পাদক সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী। তিনি মনে মনে বলেন, আমি আলেমে দীন না হলেও একাজ ইন্‌শাআল্লাহ আমিই করব।

একজন সাংবাদিক ও একটি পত্রিকার সম্পাদক হিসেবে অত্যধিক কর্ম ব্যস্ততা সত্ত্বেও তিনি ছ'মাসের মধ্যে বড়ো আকারের ছ'শ পৃষ্ঠাব্যাপী ইসলামী জিহাদের উপর এক তথ্যবহুল গবেষণামূলক গ্রন্থ রচনা করেন। গ্রন্থখানি আল্লামা সাইয়েদ সুলায়মান নদভীর পরিবেশনায় দারুল মুসান্নেফীন আযমগড় এর পক্ষ থেকে প্রকাশিত হয়। গ্রন্থখানি মাওলানা মওদূদীর প্রথম প্রচেষ্টা হলেও তা ছিলো তাঁর অসাধারণ প্রতিভা, গভীর ইসলামী জ্ঞান ও শক্তিশালী লেখনী-শক্তির স্বর্ণ ফসল। গ্রন্থখানির নাম রাখা হয় 'আল-জিহাদু ফিল্ ইসলাম'।

এ বিরাট গ্রন্থখানির প্রথম পাঁচটি অধ্যায় ইসলামী জিহাদের মর্যাদা, আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধ, সংস্কারমূলক যুদ্ধ, ইসলাম প্রচার ও তরবারি এবং যুদ্ধ ও সন্ধি সম্পর্কে ইসলামী আইন-কানুনের উপর বিস্তারিত আলোকপাত

করা হয়েছে। ষষ্ঠ অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে হিন্দু, বৌদ্ধ, ইহুদী ও খৃষ্টান ধর্মের যুদ্ধনীতি। সপ্তম অধ্যায়ে বর্তমান সভ্যতার অধীনে পরিচালিত যুদ্ধ সন্ধিকে আলোচনার বিষয়বস্তু করা হয়েছে। এ কথা দ্বিধাহীন চিত্তে বলা যেতে পারে যে, বিষয়টির উপরে এমন তথ্যবহুল, যুক্তিপূর্ণ ও প্রামান্য ও খ্যাতি আল্লাহ তায়ালা দান করেন একমাত্র মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদীকে।

আল্ জিহাদু ফিল ইসলাম-রচনার পূর্বে ১৯২৫ সালের জুলাই ও আগষ্টে কয়েক কিস্তিতে 'ইসলাম কা সারচাশমায়ে কুওয়াত' শীর্ষক এক সুদীর্ঘ প্রবন্ধ আল-জমিয়াতের সংখ্যায় তিনি প্রকাশ করেন যা গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। এ গ্রন্থে তিনি এ কথার উপর গুরুত্ব দেন যে, প্রত্যেক মুসলমানকে ইসলামী শিক্ষার মূর্ত প্রতীক হয়ে আপন আপন প্রচেষ্টায় তাবলীগে দীনের খেদমত আঞ্জাম দিতে হবে। তাঁর এ কথাগুলো সকল মহল কর্তৃক সমাদর লাভ করে।

এ যাবত জমিয়তে ওলামায়ে হিন্দ্ কংগ্রেসের এক জাতীয়তাবাদ ও রাজনৈতিক দৃষ্টিভংগীর সাথে একমত পোষণ করেনি। এ যাবত মাওলানা আবুল কালাম আযাদও এক জাতীয়তাবাদের বিরোধী ছিলেন। তিনি ১৯২৮ সালে তাঁর সম্পাদিত দৈনিক আল-হেলাল পত্রিকায় [তাং স্মরণ রাখা সম্ভব হয়নি] এক জাতীয়তাবাদের তীব্র সমালোচানা করে বলেন-'হিন্দু আওর মুসলমানোকো আপস্‌মে মেলা কর এক কওমিয়ত চীয কিয়া হ্যায়? কিয়া ইন্‌মে সে এক তেল আওর দুসরা পানি নিহি?

কিন্তু হঠাৎ ১৯২৮ সালে কোনো অজ্ঞাত কারণে জমিয়তে ওলামায়ে হিন্দের দৃষ্টিভংগীর পরিবর্তন ঘটে এবং কংগ্রেসের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করে। মাওলানা মওদূদী কোনো দিনই কংগ্রেসের দৃষ্টিভংগীর সাথে একমত হতে পারেননি। যার জন্যে তাঁকে আল-জমিয়াতের সাথে সম্পর্ক চিরতরে ছিন্ন করতে হয়। মাওলানা আবুল কালাম আযাদও তার দৃষ্টি ভংগি পরিবর্তন করেন।

গবেষণা ও ইসলামী আন্দোলনের প্রস্তুতি স্তর

আল-জমিয়ত ও সাংবাদিকতার ময়দান পরিত্যাগ করে ১৯২৮ সালের ডিসেম্বরে মাওলানা মওদূদী হায়দরাবাদ যান যেখানে ওসমানীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের 'দারুত্তরজমা' বিভাগে তাঁর বড়ো ভাই সাইয়েদ আবুল খায়র মওদূদী এক দায়িত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

হায়দরাবাদ অবস্থান কালে মাওলানা সাল্‌জুক বংশের ও দাক্ষিণাত্যের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনা করেন। তিনি ইবনে খালকানের ঐসব অধ্যায়েরও তরজমা করেন, যা মিসরে ফাতেমীয় খলিফাদের সম্পর্কে লিপিবদ্ধ করা হয়। সম্ভবতঃ তিনি শেষোক্ত কাজটি ওসমানীয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুরোধে করেন। উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের তরজমা বিভাগের অনুরোধে তিনি 'আল্ হিকমাতুল্ মুতাআলিয়া ফিল্ আস্ ফারিল আকালিয়া' নামক গ্রন্থের চার খন্ডের মধ্যে শেষ দু'খন্ডের তরজমা করেন। এ ছিলো আল্লামা সদরুদ্দীন সিরাজীর আরবী ভাষায় লেখা দর্শন শাস্ত্রের একটি অতি জটিল গ্রন্থ। এ সঠিক তরজমার জন্য তরজমা বিভাগ থেকে তাঁকে মোটা অংকের পারিশ্রমিক দেয়া হয়। সাড়ে তিন হাজার পৃষ্ঠাব্যাপী তরজমার কাজ তিনি মাত্র আট মাসে শেষ করেন। পারিশ্রমিকের অর্থ দিয়ে তিনি হাদীস তাফ্সীরের বহুমূল্যবান গ্রন্থ, ইন্সাইক্লোপেডিয়া বৃটেনিকার সকল খন্ড খরিদ করেন এবং পাঁচ হাজার টাকা তাঁর পরিকল্পিত ইসলামী খেদমতের জন্যে জমা রাখেন।

তারপর তিনি ইসলামের বিভিন্ন দিকের উপর গবেষণা ও আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা ও জ্ঞান লাভের উদ্দেশ্যে হায়দরাবাদ, ভূপাল ও দিল্লী যাতায়াত করে তথাকার গ্রন্থাগারগুলো থেকে জ্ঞান সঞ্চয় করতে থাকেন। আল্লাহ্ তায়ালা তাঁকে এমন অসাধারণ স্মরণ শক্তি দান করেন যে, যা তিনি একবার পড়েন তার অন্তর্নিহিত তাৎপর্য পুরোপুরি উপলব্ধি করেন এবং তা আর কোনো দিন ভুলে যাননা। মাওলানা একবার বলেন, বিভিন্ন গ্রন্থাগারের বিভিন্ন আলমারীতে যতো মূল্যবান বই-পুস্তক ছিলো তার সব কটি তাঁর হৃদয়ে গাঁথা আছে।

তৎকালীন ভারতে মুসলমানদের অবস্থা

বর্তমান শতকের বিশের দশকে খেলাফত আন্দোলন ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে এক অভূতপূর্ব দীনী ও জিহাদী প্রাণ চাঞ্চল্য সৃষ্টি করে। কিন্তু সমগ্র ভারতব্যাপী পাঁচ ছ'বছর ক্রমাগত খেলাফত আন্দোলন চলার পর যখন তা একেবারে ব্যর্থ হয়ে যায়, তখন মুসলমানদের সকল আশা-ভরসা নির্মূল হয়ে যায়। তারা মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ে নৈরাশ্যের ক্ষোভে তারা দিশেহারা হয়ে পড়ে রাজনৈতিক ময়দানে প্রতিপক্ষের মুকাবিলা করার সকল হিম্মত ও তাকত্ তারা হারিয়ে ফেলে। জনসাধারণও তাদের নেতৃবৃন্দের প্রতি আস্থা হারিয়ে পথহারা হয়ে পড়ে। জমিয়তে ওলামায়ে হিন্দ্ ত কংগ্রেসের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করেছে এবং খেলাফত আন্দোলনের অন্যতম নেতা মাওলানা আবুল কালাম আযাদও আর কোনো উপায় নেই মনে করে কংগ্রেসের সাথে ঘনিষ্ট হয়ে যান।

এ সুযোগে কংগ্রেস একজাতীয়তার ভিত্তিতে স্বাধীনতা আন্দোলন শুরু করে এবং মুসলমানদেরকে উপেক্ষা করে চলে। তদুপরি কংগ্রেসের পক্ষ থেকে উপরোক্ত উদ্দেশ্যে গণ-সংযোগ আন্দোলন [Mass contact movement] শুরু হয়। পাশাপাশি শুদ্ধি আন্দোলনও প্রকাশ্যে এবং জোরেশোরে চলতে থাকে।

পাশ্চাত্য সভ্যতা ও চিন্তাধারা শিক্ষিত মুসলমানদেরকে ত বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিলো। উপরন্তু বহু সংখ্যক বুদ্ধিজীবী ও ছাত্র সমাজ কমিউনিজমের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ে। আলেমদের মধ্যেও অনেকে এ রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়ে। স্বয়ং জমিয়তে ওলামায়ে হিন্দের মুখপত্র সমাজতন্ত্রের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে বিষ ছড়াতে থাকে। আলীগড় মুসলিম ইউনিভার্সিটি বলতে গেলে সমাজতন্ত্রের শিক্ষা ও দীক্ষা কেন্দ্র হয়ে পড়ে।

এসব কিছু ছিলো একটা সর্বগ্রাসী ও সর্বনাশী প্লাবনের সংকেত ধ্বনী। ঠিক এ সময় মাওলানা মওদূদী সাংবাদিকতার পেশা পরিত্যাগ করে বেকার জীবন যাপন করছিলেন। মাওলানা মানাযের আহ্সান গিলানী মাওলানার প্রতি সহনাভূতিসম্পন্ন হ'য়ে হায়দরাবাদের নিজামের প্রধান মন্ত্রী

স্যার আকবর হায়দারীর সাথে সাক্ষাৎ করে ওমানীয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে মাসিক আট'শ টাকা বেতনে এক অধ্যাপকের পদ ঠিক করেন। মাওলানা তা গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানান। তাঁর বড়ো ভাই তাঁকে বহুক্ষণ ধরে বুঝালেন। কিন্তু মাওলানা বলেন, ভাইজান! অবস্থা অত্যন্ত নাজুক হয়ে পড়েছে। আমি দেখছি, যে প্লাবন আসছে তা ১৮৫৭ সালের ইংরেজদের বিপ্লবের চেয়ে ঢের বেশী মারাত্মক। এ বিপদ সম্পর্কে মুসলমনাদেরকে সতর্ক করে দেয়া আমার কর্তব্য। আমার সাধ্যমত তাদের খেদমত করার চেষ্টা অবশ্যই আমি করব। আর এক মুহূর্ত সময় নষ্ট করা যেতে পারেনা। আমার বিশ্বাস যদি আমার উদাত্ত আহ্বানের মধ্যে আন্তরিকতাও সততা থাকে, তাহলে আমার মনের আবেগ ব্যর্থ হবেনা।

তর্জুমানুল কুরআনের মাধ্যমে ইসলামী আন্দোলন

ইংরেজী ১৯৩১ সালের ৩১শে জুলাই মাওলানা মওদূদী দিল্লী থেকে হায়দরাবাদ ফিরে আসেন। হায়দরাবাদ শহরের জনৈক নেকদিল মুসলমান আবু মুহাম্মদ মুসলেহ্ 'মজলিসে্ তাহ্‌রিকে কুরআন' নামে একটি সংস্থা কায়েম করে তার পক্ষ থেকে 'তর্জুমানুল কুরআন' নামে একটি মাসিক পত্রিকা কিছু কাল যাবত বের করছিলেন। উদ্দেশ্য ছিলো কুরআনের পবিত্র বাণী ঘরে ঘরে পৌছিয়ে দেয়া। তিনি মাওলানা মওদূদীর প্রজ্ঞা, প্রতিভা ও অগাধ ইসলামী জ্ঞানের প্রতি মুগ্ধ হ'য়ে তর্জুমানুল কুরআনের সম্পাদনা ভার তাঁর উপর ন্যস্ত করেন। ইসলামী দাওয়াত ও আন্দোলনের কাজে পত্রিকাটিকে পুরোপুরি ব্যবহার করতে পারবেন বলে মাওলানা এ দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। তখন থেকে মাসে তর্জুমানুল কুরাআনের পশ্চাৎ পৃষ্ঠায় [Rack Page] নিম্নের কথাগুলো প্রতি মাসে নিয়মিত ছাপা হতে থাকেঃ-

'সমগ্র ভারতে এ ধরনের পত্রিকা মাত্র এ একটি। এর একমাত্র উদ্দেশ্য হলো আল্লাহ্‌র কালেমা বুলন্দ করা ও জিহাদ ফী সাবিলিল্লাহ্‌র ডাক দেয়া। দুনিয়ায় যেসব চিন্তাধারা, মতবাদ ও সভ্যতা সাংস্কৃতির মূলনীতি ছড়ানো হচ্ছে, কুরআনের দৃষ্টিকোণ থেকে তার পর্যালোচনা সমালোচনা

করা; দর্শন বিজ্ঞান, রাজনীতি, অর্থনীতি, সংস্কৃতি ও সামাজিকতা মোটকথা প্রতিটি বিষয়ের কুরআন সুন্নাহ্র উপস্থাপিত মূলনীতির আলোকে ব্যাখ্যা দান এবং বর্তমান যুগের অবস্থার সাথে এসব মূলনীতিকে সুসমঞ্জস করা এ পত্রিকাটির মূল লক্ষ্য ও আলোচ্য বিষয়। এ পত্রিকাটি উম্মতে মুসলিমাকে এক নব জীবনের দাওয়াত দিচ্ছে। তার দাওয়াতের সার মর্ম এইঃ

নিজের মন মস্তিষ্ককে মুসলমান বানাও। জাহেলীয়াতের রীতি পদ্ধতি পরিহার করে ইসলামের সিরাতুল মুস্তাকীমের উপরে চলো। কুরআন হাতে নিয়ে বেরিয়ে পড় এবং দুনিয়ার বুকে বিজয়ীর বেশে অবস্থান করো।"

আল্লাহ তায়ালার খাস মেহেরবাণীতে অল্প বয়সেই সাইয়েদ মওদূদী একজন সূক্ষ্মদর্শী, তত্ত্ববিদ ও তত্ত্বদর্শীর গুণাবলী অর্জন করেছিলেন। তিনি একজন সুদক্ষ ও অভিজ্ঞ চিকিৎসকের ন্যায় মুসলিম জাতির সত্যিকার ব্যাধি নির্ণয় করে তার সঠিক ব্যবস্থাপত্রও দান করেন। মাওলানা তাঁর প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'মুসলমান আওর মওজুদা সিয়াসী কাশমাকাশ," প্রথম খন্ডের ভূমিকায় বলেন,

"প্রত্যেকেই একটুখানি চিন্তাভাবনা করলে এ কথা বুঝতে পারে যে, একটি পুরাতন আন্দোলনকে তার বিকৃতি ও পতনের পর পূনর্জাগরিত করা কোনো নতুন আন্দোলন শুরু করা অপেক্ষা বড়ো কঠিন ও জটিল। নতুন আন্দোলনকারীর পথ ত পরিষ্কার থাকে। তাকে ত এমন সব লোকের সম্মুখীন হতে হয় যারা আন্দোলন সম্পর্কে অনবহিত। তাকে শুধু তার আন্দোলনের মূলনীতি ও উদ্দেশ্য পেশ করতে হয়। তারপর লোক তার দাওয়াত হয় গ্রহণ করবে নয় ত প্রত্যাখান করবে। কিন্তু যে ব্যক্তি কোনো পুরাতন আন্দোলনকে তার পতন ও বিকৃতির পর পুনর্জীবিত করতে চায়, তার কাজ শুধু ততোটুকু হয়না যে, সে আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্ত নয় এমন সব লোকের কাছেই তার দাওয়াত পেশ করবে। বরঞ্চ তাকে ঐসব লোকের প্রতিও দৃষ্টি রাখতে হয় যারা আগে থেকে আন্দোলনের সাথে সংশ্লিষ্ট। সে তাদেরকে কিছুতেই উপেক্ষা করতে পারেনা, যারা আগে থেকেই এ আন্দোলনের সাথে জড়িত এবং অন্যের তুলনায় নিকটতম।

এখন তাকে সর্বপ্রথম দেখতে হয় যে তাদের অধঃপতন-অবনতি কতোখানি হয়েছে এবং মূল আন্দোলনের প্রভাব এদের মধ্যে কতোটুকু বাকী রয়েছে। তারপর তাকে চিন্তা করতে হয় যে পতনের দিকে যতোদূর তারা অগ্রসর হয়েছে, তার থেকে যেনো আর সামনে এগুতে না পারে এবং আন্দোলনের যতোটুকু প্রভাব তাদের মধ্যে আছে তা যেনো সংরক্ষিত থাকে।.......সংরক্ষণের এ প্রক্রিয়ায় কিছুটা সাফল্য লাভের পর এটা লক্ষ্য করা তার জন্যে অনিবার্য হয়ে পড়ে যে তারা যেনো বর্তমান অবস্থার উপরেই স্থির হয়ে থাকে। বরঞ্চ মূল আন্দোলনের দিকে তাদেরকে টেনে আনতে হবে। যাতে অন্য কিছু তাদের লক্ষ্য না হয়ে পড়ে এবং তাদের চেষ্টা চরিত্রের কেন্দ্রবিন্দু অন্য কিছু না হয়ে পড়ে তার দিকেও তাকে লক্ষ্য রাখতে হয়। এসব স্তর অতিক্রম করার পর সাধারণ দাওয়াত পেশ করার সুযোগ তার আসে এবং সে তখন এক পর্যায়ে পৌঁছে যায় যেখান থেকে সে এক নতুন আন্দোলন পেশকারীর কাজ শুরু করতে পারে।"

মাওলানা বলেন, "যেহেতু আমার লক্ষ্য ছিলো ইসলামী আন্দোলনের পুনর্জাগরণ, সে জন্যে আমাকে উপরোক্ত ক্রমানুসারে আমার উদ্দেশ্যের দিকে অগ্রসর হতে হয়েছে। তর্জুমানুল কুরআনের প্রথম চারটি বছর আমাকে এ চেষ্টাই করতে হয়েছে যে মুসলমানদের বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে গোমরাহি যে, যে রূপ ধারণ করেছিলো, সুস্পষ্ট করে তা ধরে দিতে হয়েছে এবং ইসলাম থেকে তাদের মধ্যে দৈনন্দিন যে দূরত্ব সৃষ্টি হচ্ছিলো তা রুখবার চেষ্টা করেছি।"

মাওলানা মওদুদীর উপরোক্ত মহান দায়িত্ব ও চেষ্টা চরিত্রের বিশদ বিবরণ দেখতে পাওয়া যায় তাঁর 'তানকীহাত' গ্রন্থে যা বাংলা ভাষায় ইসলাম ও পাশ্চাত্য সভ্যতার দ্বন্দ্ব নামে প্রকাশিত হয়েছে।

উল্লেখ্য যে আবু মুহাম্মদ মুসলেহ সাহেবের মালিকানাধীন যে তর্জুমানুল কুরআন মাওলানা সম্পাদনা করছিলেন, ১৯৩২ সালের প্রারম্ভেই তার মালিকানা তিনি খরিদ করে স্বাধীনভাবে দীন ও মিল্লাতের খেদমত করতে থাকেন। এভাবে পাঁচ বছর অতীত হওয়ার পর ১৯৩৭ সালে ভারতের রাজনৈতিক আকাশে এক ভয়ংকর কালো মেঘের সঞ্চার হয় এবং তার

থেকে ভৌগলিক জাতীয়তাবাদের যে প্রবল ঘূর্ণিবার্তা শুরু হয় তার প্রচন্ড আঘাতে মুসলমানদের জাতীয় সত্তা বিপন্ন হয়। ঘটনা এই যে, ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের অধীনে সারা ভারতে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় এবং ১৯৩৭ সালে সাতটি প্রদেশে কংগ্রেস মন্ত্রী সভা গঠিত হয়।

ভৌগলিক একজাতীয়তার ভিত্তিতে নির্বাচনের পর সংখ্যাগরিষ্ঠের হাতে ভারতের ভবিষ্যৎ ক্ষমতা হস্তান্তরের কি ভয়াবহ ও বিষময় ফল হতে পারে- তারই বাস্তব প্রমাণ পেশ করলো এই কংগ্রেসী মন্ত্রিসভাগুলো। এ প্রদেশগুলোতে [বিহার, উড়িষ্যা, যুক্তপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, মাদ্রাজ, বোম্বে] মুসলমানদের মৌলিক অধিকার ক্ষুণ্ন করা হয়। ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে বাধানিষেধ আরোপ করা হয়। সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা বেড়ে যায়, গান্ধীর ওয়াধা স্কীম অব এডুকেশন, বিদ্যামন্দির প্রভৃতি শিক্ষা ব্যবস্থার পরিকল্পনার মাধ্যমে মুসলমান জাতির স্বাতন্ত্র্য বিলুপ্তির ষড়যন্ত্র দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। মুসলমানদেরকে গোলাম জাতিতে পরিণত করার অপপ্রয়াস চলতে থাকে। দৃশ্যতঃ এ প্রদেশগুলোতে হিন্দু রামরাজত্ব কায়েম হয়। সীমান্ত প্রদেশে কংগ্রেসী মন্ত্রিসভা কায়েম হলেও তা ছিলো মুসলিম সংখ্যারিষ্ঠ এবং প্রধানমন্ত্রী ছিলেন মুসলমান-ডাঃ খান, সীমান্ত গান্ধীর ভাই।

এটা উল্লেখযোগ্য যে, উনচল্লিশের মাঝামাঝি যখন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শুরু হয় যার এক পক্ষের সাথে বৃটিশ সরকার সংশ্লিষ্ট ছিলেন এ যুদ্ধের ব্যাপারে বৃটিশের সাথে সহযোগিতার প্রশ্নে ভারতীয় কংগ্রেস দ্বিমত পোষণ করে এবং প্রতিবাদস্বরূপ সকল কংগ্রেসী মন্ত্রিসভা একসাথে পদত্যাগ করে। যার জন্যে মুসলিম লীগ সারা ভারতে শুকরিয়া দিবস পালন করে। এর বেশী কিছু করার তাদের ছিলোনা।

যা হোক এসব মন্ত্রিসভার আমলে একবার হায়দারাবাদ থেকে দিল্লী সফরকালে মাওলানা মওদুদী লক্ষ্য করেন বিভিন্ন ষ্টেশনে মুসলমানগণ জনৈক হিন্দু নেতা-ডাঃ খানের সাথে এমনভাবে দেখা সাক্ষাৎ করছে যেনো গোলাম তার প্রভুর সামনে নতশিরে কাকুতি-মিনতি জানাচ্ছে। মাওলানা এ দৃশ্য দেখে অত্যন্ত মর্মাহত ও বিচলিত হন। তিনি স্পষ্টই বুঝতে পেরেছিলেন গণসংযোগের [Mass Contact Movement] মাধ্যমে

ভারতীয় জাতীয়তাবাদের আন্দোলন এবং হিন্দুদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রাধান্য মুসলমানদের দৃষ্টিভঙ্গী ও জীবনযাপন পদ্ধতি এতোটা বদলে দেবে যে, দু'এক পুরুষের মধ্যে ভারতে ইসলাম এতোটা অপরিচিত হয়ে পড়বে যতোটা জাপান অথবা আমেরিকায় অপরিচিত রয়েছে এবং এ অবস্থা কিছুতেই চলতে দেয়া যায়না। তাই মাওলানা শক্ত হাতে কলম ধরেন এবং মুসলমান আওর মওজুদা সিয়াসী কাশমাকাশ শীর্ষক সুদীর্ঘ প্রবন্ধ লেখা শুরু করেন-যা চল্লিশের আগে তিন খন্ডে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়।

দারুল ইসলাম ট্রাস্ট গঠন ও ইসলামী আন্দোলনের লক্ষ্যে দলগঠনের পটভূমিকা রচনা

উনিশ শ' সাইত্রিশ সালে আল্লামা ইকবাল হায়দরাবাদ থেকে পাঞ্জাবে হিজরত করার জন্যে মাওলানা মওদূদীকে আহ্বান জানান। আল্লামা ইকবাল তর্জুমানুল কুরআনের মাধ্যমে মাওলানার গুণমুগ্ধ হয়ে পড়েছিলন। অসুস্থতা ও শারীরিক দুর্বলতার কারণে তিনি কখনো সাইয়েদ নাযীর নিয়াযী এবং কখনো মিয়া মুহাম্মদ শফীকে দিয়ে তর্জুমানুল কুরআন পড়াতেন এবং মনোযোগ দিয়ে শুনতেন।

ঠিক এ সময়ে জনৈক অবসরপ্রাপ্ত এসডিও চৌধুরী নিয়ায আলী তাঁর ষাট-সত্তর একর জমি ইসলামের খেদমতের জন্যে ওয়াকফ করেছিলেন। সেখানে বিভিন্ন ধরনের পাকা ঘর-বাড়ী তৈরি করে বিশেষ পরিকল্পনার অধীনে দীনের বৃহত্তর খেদমতের অভিলাষী তিনি ছিলেন। তিনি এ ব্যাপারে আল্লামা ইকবালের পরামর্শ চাইলে আল্লামা একমাত্র মাওলানা মওদূদীকেই এ কাজের জন্যে যথাযোগ্য ব্যক্তি মনে করেন। মাওলানা মওদূদী ডাঃ ইকবালের অনুরোধে তাঁর সাথে বিস্তারিত আলোচনার পর এ কাজের দায়িত্ব গ্রহণ করতে রাজী হন এবং চিরদিনের জন্যে হায়দরাবাদ পরিত্যাগ করে ১৯৩৮ সালের ১৬ই মার্চ পূর্ব পাঞ্জাবের পাঠানকোট নামক স্থানে হিজরত করেন। অতঃপর 'দারুল ইসলাম' নামে একটি ট্রাস্ট গঠন করে তার মহান কাজের সূচনা করেন।

দারুল ইসলামের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ছিলো নিম্নরূপ ঃ

১. খিলাফতে রাশেদার অবসানের পর মুসলমানদের সামনে চিন্তা ও কাজের দিক দিয়ে কোনো আদর্শ পরিবেশ ছিলোনা এবং আজকাল মুসলমানদের জন্যে দারুল ইসলামের কোনো নমুনা কোথাও বিদ্যমান নেই।

২. এখন এ উদ্দেশ্যে কাজের সূচনা করতে হলে এমন এক জনপদের প্রয়োজন যেখানে আচার-আচরণ, স্বভাব-চরিত্র, কথাবার্তা, খাওয়া-দাওয়া ও উঠা-বসার মধ্য দিয়ে ইসলামের প্রাধান্য সূচীত হবে এবং গোটা পরিবেশে ইসলামের প্রাণ সঞ্চারিত হবে।

৩. এখানে ইসলামী শিক্ষার সাথে সাথে ইসলামী চরিত্র গঠনেরও ব্যবস্থা থাকবে এবং এখানে দীনি ইলমের সাথে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানেও কিছু লোককে বিশেষজ্ঞ হিসেবে গড়ে তোলা হবে-যেনো তাঁরা চিন্তার ক্ষেত্রে বাতিল ব্যবস্থাকে চ্যালেঞ্জ করতে পারেন।

৪. এ সংস্থার অধীনে মুবাল্লেগীনের একটি সুদক্ষ ও চরিত্রবান টীম তৈরি করা হবে-যারা মুসলমান জনপদে ইসলামী চিন্তাধারা ও কাজের প্রচার প্রসার করবেন এবং তারপর তাদেরকে সংগঠিত করবেন।

৫. এ ইসলামী পরিবেশে অবস্থান করার জন্যে সাময়িকভাবে বাইর থেকেও কিছু লোক আসতে পারবে-যাতে করে এ পরিবেশের প্রভাবে তাদের আকীদাহ-বিশ্বাস ও স্বভাব-চরিত্রে পরিবর্তন ঘটতে পারে। অমুসলিম বিশেষজ্ঞ ও পন্ডিতগণও এখানে এসে ইসলামী জীবনযাপনের নমুনা সচক্ষে দেখতে পারবেন। অতএব এভাবেই খিলাফতে রাশেদার মহান সভ্যতাকে তুলে ধরা যেতে পারে।

দারুল ইসলামে হিজরত করার সিদ্ধান্তের পর মাওলানা ঘোষণা করেন যে, ১৯৩৮ সালের ১৮ই জানুয়ারী তর্জুমানুল কুরআনের হায়দরাবাদ অফিস বন্ধ হয়ে যাবে এবং পাঞ্জাবের গুরুদাসপুর জেলার অধীন জামালপুর, পাঠানকোটের দারুল ইসলামে ২৩শে জানুয়ারী তর্জুমানুল কুরআনের অফিস খোলা হবে।

আটত্রিশের ১৬ই মার্চ পাঠানকোটে পৌছার পর ঐদিনই তিনি ট্রাস্টের ওয়াকফ কমিটির সামনে দারুল ইসলামের শর্তনামা পেশ করলে কমিটি

তা অনুমোদন করেন। তারপর মাওলানা তাঁর কাজের পরিকল্পনা তৈরী করেন।

প্রাথমিক পর্যায়ে মাওলানার সাথে ট্রাস্টের যারা দায়িত্ব গ্রহণ করেন তাঁরা ছিলেন মাওলানা সদরুদ্দীন ইসলাহী, জনাব আব্দুল আযীয শার্কী, মিস্ত্রী মুহাম্মদ সিদ্দীক এবং সাইয়েদ মুহাম্মদ শাহ। মাওলানা মাত্র চারজন সহকর্মী নিয়ে ইসলামী আন্দোলনের যে বীজ বপন করেন, তা পরবর্তীকালে এক বিরাট ও শক্তিশালী বৃক্ষে পরিণত হয়-যার শাখা-প্রশাখা ও পত্র-পল্লব গোটা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে।

শাসনতান্ত্রিক প্রস্তাব

আগেই বলা হয়েছে-চিন্তার ক্ষেত্রে বিপ্লব সৃষ্টিকারী মাওলানার 'তর্জুমানুল কুরআন' তার দপ্তরসহ পাঠানকোট দারুল ইসলামে স্থানান্তরিত হয়েছে। মাওলানা এ বছরেই তর্জুমানুল কুরআনের অক্টোবর, নবেম্বর ও ডিসেম্বরের সংখ্যার পর পর তিনটি বিকল্প শাসনতান্ত্রিক প্রস্তাব সরকার ও জাতির সামনে রাখেন।

যেসব কারণে মাওলানা তিনটি বিকল্প শাসনতান্ত্রিক প্রস্তাব উপস্থাপন করেন তার কারণ এই যে, একদিকে পাশ্চাত্য জাতীয়তাবাদের প্রচারণা এবং অপরদিকে ভারতের একজাতীয়তার ভিত্তিতে শাসন ক্ষমতা হস্তগত করার সংগ্রাম চলছিলো, যা মুসলিম জাতির পতনেরই সংকেত ধ্বনী করছিলো। মাওলানা বলিষ্ঠ যুক্তি দ্বারা উভয় জাতীয়তাবাদ খন্ডন করে ইসলামী জাতীয়তা সুস্পষ্ট করে তুলে ধরেন। একজাতীয়তার ভয়াবহ পরিণতি বিশ্লেষণ করতে গিয়ে মাওলানা বলেন-

"আমাদের আসল পজিশন এখন এই যে, যদি তাঁরা [সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু সম্প্রদায়] আমাদের উপর যুলুম করেন, তাহলে আমাদের কোনো প্রতিনিধি সরদার প্যাটেলের খেদমতে অথবা অন্য কোনো সরকারের কাছে গিয়ে আবেদন-নিবেদন করবে। তারপর এ যুলুমের প্রতিকার তখনই সম্ভব যখন নেহায়েৎ মেহেরবাণী করে তাঁরা অবস্থার প্রেক্ষিতে কোনো প্রতিকার করতে চাইবেন।"

প্রকৃতপক্ষে

এ পজিশন কিছুতেই গোলামির পজিশন থেকে ভিন্নতর নয়, যা এ যাবত ইংরেজ শাসনের অধীনে আমাদের রয়েছে।

এ পরিস্থিতিতে প্রশ্ন হলো, তাহলে মুসলমান এখন কি করবে? এ প্রশ্নের জবাবে মাওলানা তিনটি বিকল্প প্রস্তাব পেশ করেন। তা হলোঃ

প্রথম প্রস্তাব

[ক] রাষ্ট্র ব্যবস্থা হবে আন্তর্জাতিক ফেডারেশনের [International Federation] মূলনীতির ভিত্তিতে, অন্য কথায় এটা একটি মাত্র জাতির কোনো রাষ্ট্র হবেনা বরঞ্চ চুক্তিবদ্ধ জাতিসমূহের একটা রাষ্ট্র [A State of Federated Nations].

[খ] এ ফেডারেশনে শরীক প্রত্যেক জাতি সাংস্কৃতিক স্বায়ত্তশাসনের [Cultnural Autonomy] অধিকারী হবে। অর্থাৎ প্রত্যেক জাতি তার জীবনের বিশেষ পরিমন্ডলে আভ্যন্তরীণ ব্যবস্থাপনা ও সংস্কার সংশোধনের জন্যে সরকারের ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারবে।

প্রস্তাবের প্রতিটি বিষয়ের বিশদ ব্যাখ্যাদান করা হয়-যার অবকাশ এখানে নেই।

দ্বিতীয় প্রস্তাব

আন্তর্জাতিক ফেডারেশনের প্রস্তাব যদি গৃহীত না হয়, তাহলে দ্বিতীয় প্রস্তাব এই যে, বিভিন্ন জাতির পৃথক পৃথক ভূখন্ডের সীমানা নির্ধারিত করা হোক, যেখানে তারা তাদের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র বানাতে পারবে। লোকসংখ্যা বিনিময়ের জন্যে পঁচিশ অথবা কম-বেশী দশ বছরের মুদ্দৎ নির্ধারিত করে দেয়া হোক। প্রত্যেক রাষ্ট্রকে অধিক পরিমাণ স্বায়ত্তশাসনের অধিকার এবং কেন্দ্রীয় ফেডারেশনে অতি অল্প এখতিয়ারই রাখা হোক। এরও বিশদ ব্যাখ্যা দেয়া হয়।

তৃতীয় প্রস্তাব

এ প্রস্তাবও যদি গৃহীত না হয় তাহলে আমরা দাবী করবো যে, আমাদের রাষ্ট্রগুলোকে স্বতন্ত্রভাবে কায়েম করা হোক এবং তাদের পৃথক পৃথক ফেডারেশন হোক।

শেষ প্রস্তাবটি ছিলো প্রকারন্তরে মাওলানার [Partition of India] ভারত বিভাগেরই] প্রস্তাব-যা মুসলিম লীগ পনেরো মাস পরে গ্রহণ করে। বিকল্প প্রস্তাব তিনটি উপস্থাপনের পর মাওলানা বলেন-

"আমাদের ভারতীয়গণ এবং তাঁদের ইংরেজ পৃষ্ঠপোষকদের এ কথা ভালো করে উপলব্ধি করা উচিত যে, বর্তমান শাসনতন্ত্র ও প্রতিটি শাসন ব্যবস্থা যা এক জাতীয়তার ভিত্তিতে গণতান্ত্রিক সংস্থাগুলো কায়েম করে তা কোনো অবস্থাতেই আমাদের গ্রহণযোগ্য নয়।"

উপরন্তু মাওলানা বলেন, এখন শুধু জান-মালের কুরবানীর দ্বারাই ঘটনাবলীর গতি পরিবর্তন করা যেতে পারে। যতোক্ষণ আমরা এ কথা প্রকাশ না করব যে, এ শাসনতন্ত্র আমাদের জীবন্ত মস্তকের উপর নয়, বরঞ্চ কবরের উপরই কার্যকর করা যেতে পারে এবং যতোক্ষণ আমরা আমাদের কাজের দ্বারা এ কথা বলে না দেব যে, মুসলমান তাদের জাতীয় জীবনের জন্যে জীবন দেয়ার শক্তিও রাখে, ততোক্ষণ পর্যন্ত এ শাসনতন্ত্রের একটি অক্ষরও পরিবর্তন করা হবেনা আর না তাঁরা জাতীয় গণতান্ত্রিক ধর্মহীন রাষ্ট্র আমাদের উপর চাপিয়ে দেয়া থেকে বিরত থাকবেন যার জন্যে ইংরেজ, হিন্দু আমাদের ভেতরের মুনাফিকগণ এবং অন্যান্য বহু বোধশক্তিহীন লোক একত্রে মিলে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

ভারতীয় মুসলিম রাজনীতির ময়দানে মাওলানার এক নজীরবিহীন অবদান এই যে, তিনি হিন্দুদের একজাতীয়তার জোরদার আন্দোলনের মুকাবিলায় স্বতন্ত্র ইসলামী জাতীয়তাকে সুস্পষ্ট করে তোলেন এবং এই দ্বিজাতিত্বের [Two-Nation Theory] ভিত্তিতেই মুসলিম লীগ ১৯৪০ সালের ২৩শে মার্চে তার লাহোর অধিবেশনে পাকিস্তান প্রস্তাব গ্রহণ করে।

উক্ত লীগের প্রস্তাবের ভিত্তিতে যে পাকিস্তান আন্দোলন শুরু হয় মাওলানা তার সাথে সহযোগিতা করতে পারেননি। এ ব্যাপারে তাঁর মতানৈক্য এ ছিলো যে, এ আন্দোলন পরিচালিত হচ্ছিলো জাতীয়তার দৃষ্টিকোণ থেকে ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে নয়। দ্বিতীয়তঃ মুসলিম লীগের

মধ্যে বিভিন্ন চিন্তাধারা ও আকীদাহ বিশ্বাসের লোক ছিলো। মুষ্টিমেয় কয়েকজন ব্যতীত অন্যান্যের মধ্যে ইসলামী জ্ঞান ও চরিত্রের কোনো চিহ্ন মাত্র ছিলোনা। তাছাড়া ভারত বিভক্তি, দ্বিজাতিত্ব ও পাকিস্তান মতবাদের প্রশ্নে মাওলানার দ্বিমত তো ছিলোই না বরঞ্চ এসব ধারণা তিনি সুস্পষ্ট করে তুলে ধরেন। মাওলানা বার বার মুসলিম লীগের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দকে বলেন যে, যে ধরনের রাষ্ট্রের কথা তাঁরা বলছেন তার জন্যে সে আদর্শের ভিত্তিতে একটি চরিত্রবান কর্মীবাহিনী গঠন করা উচিত। কিন্তু তাঁর এ কথায় তাঁরা মোটেই কর্ণপাত করেননা।

যা হোক পাকিস্তান আন্দোলন শুরু হবার পর, পাকিস্তান তথা ইসলামী রাষ্ট্র সম্পর্কে শিক্ষিত সমাজে নানান প্রশ্নের উদয় হতে থাকে।

ঐ বছরেই ১১ই সেপ্টেম্বর আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের স্ট্রাচী হলে আঞ্জুমানে ইসলামী তারিখ ও তামাদ্দুনের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত এক জনসমাবেশে মাওলানা মওদূদী এক দীর্ঘ বক্তৃতা করেন। আলোচ্য বিষয় ছিলো ইসলামী রাষ্ট্র কিভাবে কায়েম হয়। তার এ বক্তৃতা পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় এবং বিভিন্ন ভাষায় তার তরজমা হয়। 'ইসলামী বিপ্লবের পথ' বইখানি তারই বাংলা অনুবাদ।

মাওলানা তাঁর বক্তৃতায় ইসলামী রাষ্ট্রের পূর্ণাঙ্গ চিত্র, তা কায়েম করার বিজ্ঞানসুলভ পদ্ধতি, ধারা ও বৈশিষ্ট্য এবং ভুল পন্থার ভয়াবহ পরিণাম বিশ্লেষণ করেন। কিন্তু এসবের প্রতি কোনো ভ্রুক্ষেপ না করে পাকিস্তান আন্দোলন তার নিজস্ব ধারায় চলতে থাকে। মাওলানা তাঁর খোদা প্রদত্ত দুরদর্শিতার ফলে স্পষ্ট বুঝতে পেরেছিলেন যে, গণআন্দোলনের ফলে একটা নব রাষ্ট্রের জন্মলাভ হয়তো নিশ্চয়ই হবে। কিন্তু ইসলামী রাষ্ট্র না হয়ে তা এমন এক ভ্রান্ত পথে পরিচালিত হবে যে, তার ভয়াবহ পরিণাম ফল হতে তাকে রক্ষা করার জন্যে পূর্বাহ্নেই তার যথাযথ ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে।

জামায়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠা

জামায়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠা এমন এক সময়ে হয়, যখন সমগ্র ভারতে পাকিস্তান আন্দোলনের দেড় বছর অতীত হয়ে গেছে। পাকিস্তান আন্দোলন প্রকাশ্যতঃ ভারতীয় মুসলিমদের মধ্যে অদম্য উৎসাহ-উদ্দীপনা ও আশার সঞ্চার করেছিলো। ঠিক এমন সময়ে আর একটি দল গঠনের কি প্রয়োজন ছিলো-এ প্রশ্ন অনেকের মনেই দ্বিধা-দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করেছিলো। এ দলের প্রয়োজনীয়তা সঠিকভাবে উপলব্ধি করতে হলে অতীতের ঘটনাবলী ও তার তিক্ত অভিজ্ঞতার কিছুটা পুনরাবৃত্তি একান্ত প্রয়োজন মনে করি। এ সম্পর্কে মাওলানা মওদূদী স্বয়ং বলেন-

"প্রকৃতপক্ষে এ কোনো আকস্মিক ঘটনা ছিলোনা যে, কোনো এক ব্যক্তির মনে হঠাৎ এক খেয়াল চাপলো যে, সে একটা দল বানাবে এবং কিছু লোক একত্র করে সে একটা দল বানিয়ে ফেললো। বরঞ্চ এ ছিলো আমার ক্রমাগত বাইশ বছরের অভিজ্ঞতা, পর্যবেক্ষণ, গভীর অধ্যয়ন ও চিন্তা-গবেষণার ফসল। যা একটা পরিকল্পনার রূপ ধারণ করে এবং সে পরিকল্পনার ভিত্তিতেই জামায়াতে ইসলামী গঠিত হয়"-["জামায়াতে ইসলামীর উনত্রিশ বৎসর যাপন" অনুষ্ঠানে প্রদত্ত ভাষণ]।

মাওলানার পর্যবেক্ষণ ও অধ্যয়নের প্রতি দৃষ্টিপাত করলে জানতে পারা যায় যে, সে সময়ে উপমহাদেশের মুসলিম সমাজের মধ্যে এতোটা বৈষম্য-বৈপরিত্য বিরাজ করছিলো যে, তার থেকে স্বভাবতঃই মানুষের মনে বহু প্রশ্নের উদয় হতো। কিন্তু খিলাফত আন্দোলন চলা পর্যন্ত এসব প্রশ্ন মনের মধ্যেই চাপা ছিলো। একদিকে মুসলমানদের মধ্যে এ অদম্য প্রেরণা ছিলো যে, তুরস্কের খিলাফত এবং পবিত্র স্থানগুলোর রক্ষণাবেক্ষণের জন্যে জীবন বিলিয়ে দিতে হবে। অপরদিকে জালিয়ানওয়ালাবাগের নৃশংস হত্যাকান্ড সারাদেশে প্রতিহিংসার দাবানল প্রজ্জ্বলিত করে যার ফলে স্বাধীনতা

আন্দোলন জোরদার হয়ে পড়ে। তারপর গান্ধীর নেতৃত্বে হিন্দু-মুসলিম ঐক্য প্রতিষ্ঠা এবং সহযোগ আন্দোলন, অতঃপর তুর্কী জাতীয়তাবাদ ও প্রত্যুত্তরে আরব জাতীয়তাবাদের উত্থান, তারপর খিলাফতের বিলোপ সাধন ও ভারতে খিলাফত আন্দোলনের পতন, শুদ্ধি আন্দোলন স্বামী শ্রদ্ধানন্দের হত্যা, মুসলমানদের প্রতি পাশ্চাত্য সভ্যতা, ধর্মহীনতা ও নাস্তিকতার আগ্রাসী হামলা, বর্ণহীন ভৌগোলিক রাষ্ট্র গঠনের জন্যে একজাতীয়বাদের কলরব, হিন্দু-মুসলিম ঐক্য ভেঙ্গে যাওয়ার পর দেশব্যাপী হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা-হাঙ্গামা, সাহিত্যের মধ্যে নাস্তিকতা, অশ্লীলতা ও কমিউনিজমের ক্রমবর্ধমান প্রস্তাব, জওহর লাল নেহেরুর সমাজতন্ত্রে পুরোধার পদে সমাসীন হওয়ার প্রভৃতি সবকিছুই ১৯২৪ সালের পর থেকে পরবর্তী পনেরো বছর পর্যন্ত এমন সব ঘটনা-যার প্রত্যেকটির উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখেন জামায়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা এবং সে সবের উপর গভীরভাবে চিন্তা-গবেষণা করে তিনি নিম্ন সিদ্ধান্তে পৌঁছেন ঃ

"মুসলমানদের বাঁচার উপায় থাকলে শুধু এর মধ্যেই আছে যে, তাদেরকে আবার নতুন করে জাতির মুবাল্লিগের ভূমিকা পালন করতে হবে। শুধুমাত্র এ পন্থা অবলম্বনের মাধ্যমেই তারা সে সব জটিলতা থেকে মুক্ত হতে পারে যার মধ্যে তারা এখন নিমজ্জিত আছে।.......এ কথা তাদের মনে বদ্ধমুল করে দিতে হবে যে, ইসলামের নিজস্ব একটা জীবন বিধান আছে। তার নিজস্ব সাংস্কৃতিক ব্যবস্থা আছে, নিজস্ব রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা আছে। তার নিজস্ব চিন্তাধারা আছে, নিজস্ব শিক্ষা ব্যবস্থা আছে-যা সবদিক দিয়ে পাশ্চাত্য সভ্যতা ও তার সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো থেকে অনেক ভালো ও উচ্চমানের। সভ্যতা ও তার সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো থেকে অনেক ভালো ও উচ্চমানের। সভ্যতা-সংস্কৃতির ব্যাপারে কারো কাছে হাত পাততে হবে-এ ধারণা তাদের মন থেকে মুছে ফেলতে হবে-

[জামায়াতে ইসলামীর উনত্রিশ বৎসর যাপন অনুষ্ঠানে প্রদত্ত ভাষণ]

জামায়াত প্রতিষ্ঠাতা বলেছেন-জামায়াতে ইসলামী তাঁর দীর্ঘ বাইশ বছরের চিন্তা-গবেষণার ফসল। তাঁর মনের গভীরে বহু সূক্ষ্ম প্রশ্ন জমাট বাঁধে-যার উত্তর তালাশ করতে গিয়ে তাঁকে একটি জামায়াত গঠনের পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হয়। তিনি বলেন-

"আমাদের ইতিহাসের এক অতি গুরুত্বপূর্ণ ও ফলপ্রসু ঘটনা এই যে, আমাদের দেশে উনবিংশ শতাব্দীতে......হাজার হাজার মাইল দূর থেকে এসে একটি অমুসলিম জাতি আমাদের ঘাড়ের উপরে মজবুত হয়ে চেপে বসে।........ এ ঘটনা আমাদের জন্যে কয়েক দিক দিয়ে প্রণিধানযোগ্য।

"প্রথম প্রশ্ন যার জবাব আমাদেরকে খুঁজে বের করতে হবে তা হলো এই যে, এ ঘটনা ঘটলোই বা কেন? এটা কি কোনো আকস্মিক দুর্ঘটনা ছিলো যা বিনা কারণে আমাদের উপরে এসে পড়েছে? এ কি প্রকৃতির কোনো অন্যায়-অত্যাচার -যা বিনা অপরাধে আমাদের উপরে করা হয়েছে? আমরা কি ঠিক সঠিক পথেই চলছিলাম, কোনো দুর্বলা, কোনো দোষক্রটি আমাদের ছিলোনা? অথবা প্রকৃতপক্ষে বহুদিন যাবত আমরা আমাদের মধ্যে কিছু দুর্বলতা ও কিছু ক্রটি-বিচ্যুতি পোষণ করে আসছিলাম-যার শাস্তি একটা বৈদেশিক শক্তির গোলামি হিসেবে আমাদের উপর নেমে এলো?"

"দ্বিতীয় প্রশ্ন এই যে, এই যে বিপদটা বাইর থেকে এসে আমাদের ঘাড়ে চাপলো, একি শুধু একটি গোলামির অভিশাপ ছিলো, না তা সাথে করে এনেছিলো নিজস্ব চরিত্র, চিন্তাধারা, ধর্ম সভ্যতা-সংস্কৃতি, অর্থনীতি ও রাজনীতির অন্যান্য বহু অভিশাপ?"

"তৃতীয় প্রশ্ন এই যে, এসব বিপদ-অভিশাপের মুকাবিলায় আমাদের ভূমিকা কি ছিলো।"

[মুসলমানদের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ]

কোনো ব্যাপারে এ ধরনের প্রশ্ন উত্থাপন করে তার সূক্ষ্ম তলদেশ থেকে বিচার-বিশ্লেষণ করার লোক কমই দেখতে পাওয়া যায়। এ ব্যাপারে সাইয়েদ মওদূদীই ছিলেন একমাত্র ব্যক্তিত্ব। দৃশ্যতঃ এ প্রশ্নগুলো জামায়াত গঠনের বহু পরে ১৯৫১ সালে করাচীতে অনুষ্ঠিত জামায়াতের এক বার্ষিক সম্মেলনে সামনে তুলে ধরা হয়েছিলো, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এ ছিলো মাওলানার প্রাথমিক চিন্তা-গবেষণারই একটা অংশ। এর প্রমাণ পাওয়া যায় তাঁর বিপ্লব সৃষ্টিকারী গ্রন্থ "তানকীহাতে"

[ইসলাম ও পাশ্চাত্য সভ্যতার দ্বন্দ্ব]

এ কথা বললে সত্যের অপলাপ হবেনা যে, পাশ্চাত্যের নাস্তিকতাপূর্ণ সভ্যতা সংস্কৃতির প্রবল বন্যার গতিরোধ করার জন্যই এ ব্যক্তির আবির্ভাব হয়েছিলো। তাঁর অমর অবদানের একটা বিরাট অংশ এই যে, তিনি পাশ্চাত্যের ভীতি-বিহ্বল ও বিবস-অচেতন জাতির মধ্য থেকেই একটা সক্রিয় শক্তি দাঁড় করিয়ে দেন যা পাশ্চাত্য সভ্যতার মুকাবিলায় ইসলামী সভ্যতা-সংস্কৃতির পতাকা হাতে দাঁড়াবে। বলতে গেলে এ একটা প্লাবন প্রতিহত করার জন্যে বিপরীতমুখী আর একটি প্লাবন সৃষ্টি করা যা মাওলানা করেছিলেন।

নীতিগতভাবে সাইয়েদ মওদূদী [রঃ] মানব জীবনের কল্যাণ ও সংস্কার সম্পর্কে চিন্তা-গবেষণা করে যে সিদ্ধান্তে পৌঁছেন-তা তাঁর নিজের ভাষায়ঃ

"দুনিয়ায় ফিৎনা-ফাসাদের মূল উৎস হলো মানুষের উপর মানুষের প্রভুত্ব কর্তৃত্ব-[খোদায়ী]। এর থেকেই অনাচার-অকল্যাণের সূচনা হয় এবং এর থেকেই আজ হলাহলের বিষাক্ত প্রস্রবন প্রবাহিত হচ্ছে। ....কোথাও একটি জাতি আর একটি জাতির খোদা হয়ে বসেছে কোথাও এক শ্রেণী আর এক শ্রেণীর খোদা কোথাও একটি দল প্রভুত্ব কর্তৃত্বের আসন অধিকার করে আছে। কোথাও জাতীয় রাষ্ট্র খোদার আসনে বিরাজমান কোথাও কোনো ডিক্টেটর উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করছে, আমি ছাড়া তোমাদের আর কোনো খোদা আছে বলে আমার জানা নেই-

আরবী

এটাই হলো সেই অশুভ শক্তি যা মানুষের সকল বিপদ-মুসিবত, সকল বিপর্যয় ও ধ্বংস এবং সকল বঞ্চনার মূল কারণ। তার উন্নতি-অগ্রগতির পথে এটাই বড়ো বাধা।.....এর প্রতিকার এ ছাড়া আর কিছু হতে পারেনা যে, মানুষ সকল খোদায়ীর দাবীদার শক্তিগুলোকে প্রত্যাখ্যান করে একমাত্র আল্লাহকে নিজের 'ইলাহ' এবং একমাত্র রাব্বুল আলামীনকে নিজের 'রব' বলে মেনে নিতে হবে।....এটাই সেই বুনিয়াদী সংস্কার সংশোধনের কাজ যা আল্লাহর মহান নবীগণ মানুষের জীবনে করেছেন"-

[ইসলামী রাষ্ট্র-ইসলামের রাজনৈতিক মতবাদ]।

স্মরণ করা যেতে পারে যে, ১৯৩৭ সালে ভারতের ছ'টি প্রদেশে কংগ্রেসের হিন্দু মন্ত্রিসভা গঠিত হওয়ার পর তারা ভারতে 'রামরাজ্য' প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখছিলো। তাদের এ স্বপ্ন সফল হতে পারে যদি একজাতীয়তার ভিত্তিতে বৃটিশ ক্ষমতা হস্তান্তর করেন। এ উদ্দেশ্যে ১৯৩৮ সালে কংগ্রেস মুসলমানদের গণসংযোগ আন্দোলন [Muslim Mass Contact Movement] শুরু করে। সে সম্পর্কে মাওলানা বলেন-

"মুসলিম গণসংযোগ অভিযান শুরু হয়-যার কর্মীবাহিনী ছিলো মুসলমান কমিউনিস্ট। পরিতাপের বিষয় এই যে, আলেমদের একটা দলও তাদের সাথে সহযোগিতা করে। তাঁরা বলতেন, হিন্দু-মুসলমান মিলে এক জাতি হতে পারে এবং এ জাতির মধ্যে এক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রচলন হতে পারে-যেখানে সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটে সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে। এ মতবাদ খন্ডন করে আমি ঐসব প্রবন্ধ লিখি-যা "মুসলমান আওর মওজুদা সিয়াসী কাশমাকাশ"- তৃতীয় খন্ড এবং 'মাসলায়ে কওমিয়ত' নামে প্রকাশিত হয়।.......আমি আমার সর্বশক্তি এ কাজে নিয়োজিত করি যাতে করে মুসলমানদেরকে হিন্দু জাতীয়তার মধ্যে মিশে একাকার হয়ে যাওয়া থেকে রক্ষা করা যায়।"

-[উনত্রিশ বৎসর যাপন অনুষ্ঠানে -ভাষণ]

তার পরের ঘটনা মাওলানার ভাষায় ঃ

"তারপর ১৯৩৯ সাল এবং তারপরের কথা। মুসলিম লীগের আন্দোলন জোরদার হয়। পাকিস্তান আন্দোলনের প্রস্তুতি হতে থাকে। অবশেষে ১৯৪০ সালে আন্দোলন পাকিস্তান প্রস্তাবের রূপলাভ করে।.....সে সময়ে আমার মনের মধ্যে যে বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিলো তা হলো এই যে, মুসলমানদের মধ্যে এ অনুভূতির সঞ্চার করা হোক যে, তারা নিছক একটা জাতি নয়, বরঞ্চ একটা মুবাল্লিগ জাতি, একটা মিশনারী জাতি। তাদের এমন এক রাষ্ট্র কায়েম করা উচিত যা হবে-একটা মিশনারী রাষ্ট্র।......এ উদ্দেশ্যে আমি ধারাবাহিক প্রবন্ধ লেখা শুরু করি-যা "মুসলমান আওর মওজুদা সিয়াসী কাশমাকাশ তৃতীয় খন্ড নামে প্রকাশিত হয়।"

তারপর মাওলানা বলেন-

"যখন আমি দেখলাম যে, আমার সবকিছু অরণ্যেরোদন হয়ে পড়ছে, তখন দ্বিতীয় পদক্ষেপ-যা আমি সমীচীন মনে করলাম তা এই যে, নিজের পক্ষ থেকে একটি জামায়াত গঠন করা উচিত-যা চরিত্রবান লোক নিয়ে গঠিত হবে এবং ঐসব ফিৎনার মোকাবিলা করবে-যার পদধ্বনী শোনা যাচ্ছে।.....সে সময় যে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন আমার মনে ছিলো তা ছিলো এই যে, অবস্থা যেদিকে চলছে তাতে একটা সংকট এটা হতে পারে যে, পাকিস্তান সংগ্রামে মুসলিম লীগ বিফল মনোরথ হবে-এবং ইংরেজ ভারতে এক ভারতীয় জাতীয়তার ভিত্তিতে একটি গণতান্ত্রিক সরকার গঠন করে তা হিন্দুদের হাতে তুলে দিয়ে চলে যাবে। তখন কি করতে হবে? দ্বিতীয় অবস্থা এ হতে পারে যে, মুসলিম লীগের উদ্দেশ্য সফল হবে এবং দেশ বিভক্ত হয়ে যাবে। এ অবস্থায় কয়েক কোটি মুসলমান যে ভারতে রয়ে যাবে তাদের কি দশা হবে এবং স্বয়ং পাকিস্তানে ইসলামের দশাটাই কি হবে?...এ ছিলো এমন এক পরিস্থিতি যখন আমি এ দৃঢ় সিদ্ধান্ত করলাম যে, জামায়াতে ইসলামী নামে একটি জামায়াত গঠন করা হোক।"

[উনত্রিশ বৎসর পালন-অনুষ্ঠানে ভাষণ]

যেসব পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে জামায়াতে ইসলামী গঠন অপরিহার্য হয়েছিলো, তা আশা করি পাঠকবর্গ যথার্থই উপলব্ধি করবেন। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরবর্তী বছরগুলো এ জামায়াতের অপরিহার্যতা দিবালোকের মতো সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে।

উপরোক্ত উদ্দেশ্যে একচল্লিশের তর্জুমানুল কুরআনে মাওলানা -"এক সালেহ জামায়াত কি জরুরত" শীর্ষক দীর্ঘ প্রবন্ধ লেখেন। প্রবন্ধে তিনি বলেন, দুনিয়াকে ভবিষ্যতের অন্ধকার যুগ থেকে রক্ষা করে তাকে ইসলামের নিয়ামত দ্বারা ভূষিত করার জন্যে এতোটুকুই যথেষ্ট নয় যে, এখানে ইসলামের সঠিক ধারণা মতবাদ বিদ্যমান আছে, বরঞ্চ সঠিক মতবাদের সাথে একটি সত্যনিষ্ঠ দলেরও প্রয়োজন। এ দলের সদস্যদেরকে ঈমানের দিক দিয়ে সুদৃঢ় ও অবিচল হতে হবে এবং আমলের দিক দিয়ে হতে হবে প্রশংসনীয় ও উচ্চমানের। কারণ তাদেরকে সভ্যতা-সংস্কৃতির ভ্রান্ত ব্যবস্থা ও রীতিনীতির বিরুদ্ধে কার্যতঃ বিদ্রোহ ঘোষণা করতে হবে

এবং এ পথে আর্থিক কোরবানী থেকে শুরু করে কারাদন্ড, এমনকি ফাঁসির ঝুঁকিও নিতে হবে।

উল্লেখ্য যে, মুসলিম লীগের সাথে চিন্তা ও কর্মপদ্ধতির দিক দিয়ে মাওলানার মতানৈক্যের কারণ চৌধুরী নিয়ায আলীর সাথেও মতানৈক্য হয়। তার ফলে দারুল ইসলাম ট্রাস্টের দপ্তর ১৯৩৯ সালে ২৬শে জানুয়ারী পাঠানকোট থেকে পুঞ্চ রোড, মুবারক পার্ক লাহোরে সাময়িকভাবে স্থানান্তরিত হয়। সাথে তর্জুমানুল কুরআনের কার্যালয়ও স্থানান্তরিত হয়। পরবর্তীকালে চৌধুরী নিয়ায আলীর পীড়াপীড়িতে ১৯৪২ সালের ১৫ই জুন দারুল ইসলাম ট্রাস্ট ও তর্জুমানুল কুরআনের দপ্তরসমূহ পুনরায় পাঠানকোট স্থানান্তর করা হয়।

একচল্লিশের মার্চ মাসে তর্জুমানুল কুরআনে মাওলানা 'জামায়াতে ইসলামীর গঠন শীর্ষক এক প্রবন্ধ লেখার ফলে সমমনা লোক প্রবন্ধের ব্যাখ্যা দাবী করে মাওলানাকে পত্র লিখতে থাকেন। তার জবাবে এপ্রিল মাসের তর্জুমানুল কুরআনে বলা হয় যে, যারা উক্ত প্রবন্ধে বর্ণিত পদ্ধতিতে কাজ করতে চান তাঁরা আপন আপন জায়গায় কাজ শুরু করতে পারেন এবং সঙ্গে সঙ্গে যেন তাঁদের নাম ও ঠিকানা তর্জুমান অফিসে পাঠিয়ে দেয়া হয় যাতে করে একটা সম্মেলনের রূপ দেয়ার পথ বেরোয়। এভাবে দেড়শ'লোকের একটা তালিকা তৈরী হয় এবং এ তালিকা অনুযায়ী ২৫শে আগস্ট পঞ্চ রোড মুবারক পার্কে অবস্থিত তর্জুমানুল কুরআন কার্যালয়ে তাঁদেরকে উপস্থিত হওয়ার জন্যে দাওয়াতনামা পাঠানো হয়। তদানুযায়ী সারা ভারত থেকে পঁচাত্তরজন মর্দেমুমিন লাহোর উপস্থিত হন। তাঁদের মধ্যে এমনও অনেক ছিলেন-যারা নিজ নিজ স্থানে জামায়াতে ইসলামীর শাখা কায়েম করেছিলেন এবং কুরআন-হাদীস আলোচনার উদ্দেশ্যে সাপ্তাহিক বৈঠকও চালু করেছিলেন। এসব স্থান থেকে তাঁদের প্রতিনিধি লাহোর সম্মেলনে শরীক হন। বলতে গেলে মানসিক দিক দিয়ে জামায়াতে ইসলামী আগে থেকেই কায়েম ছিলো এবং কোনো সুস্পষ্ট কেন্দ্রীয় সংগঠন ব্যতিরেকেই তার শাখাগুলো স্থানে স্থানে কর্মতৎপর ছিলো।

সম্মেলনের কাজ ২৬শে আগস্ট সকাল আটটায় শুরু হয়। মাওলানা মওদূদী সমবেত মেহমানদের সামনে যে উদ্বোধনী ভাষণ দেন তার সারাংশ নিম্নে দেয়া হলো ঃ

"এক সময় ছিলো যখন আমি স্বয়ং গতানুগতিক ও বংশানুক্রমিক ধর্মে বিশ্বাসী ছিলাম ও তার উপর আমল করতাম। যখন জ্ঞান হলো তখন মনে হলো-নিছক এ ধরনের [যে কাজ বাপদাদাকে করতে দেখেছি] অনুসরণ অর্থহীন। শেষ পর্যন্ত আল্লাহর কিতাব ও রসূলের সুন্নাতের প্রতি মনোনিবেশ করলাম। ইসলাম নতুন করে বুঝলাম এবং ঈমান আনলাম। তারপর ক্রমশঃ ইসলামের সামগ্রিক ও বিস্তারিত ব্যবস্থা জানার ও বুঝার চেষ্টা করলাম। তারপর যখন আল্লাহ তায়ালা আমার মনকে এদিক থেকে একেবারে নিশ্চিন্ত ও নিশ্চিত করে দিলেন, তখন যে সত্যের উপর আমি স্বয়ং ঈমান আনলাম তার দাওয়াত অন্যের কাছে দেয়াও শুরু করলাম এবং এ উদ্দেশ্যে তর্জুমানুল কুরআন চালু করি।

প্রথম ক'টি বছর মনের দ্বিধা-দ্বন্দ্ব দূর করতে এবং দীনের একটা সুস্পষ্ট ধারণা পেশ করতেই কেটে গেল। তারপর দীনকে একটা আন্দোলনের আকারে চালু করার পদক্ষেপ গ্রহণ করি। এ ব্যাপারে প্রথম পদক্ষেপ ছিলো 'দারুল ইসলাম' সংস্থার প্রতিষ্ঠা। এটা হয়েছিলো ১৯৩৮ সালে। তখন চারজন মাত্র আমার সহকর্মী ছিলেন। এ ছোট্ট সূচনাটি তখন অত্যন্ত নগণ্য মনে করা হয়েছিলো। কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ আমরা হতাস হয়ে পড়িনি। ইসলামী আন্দোলনের দিকে দাওয়াত দেয়ার এবং মনমস্তিষ্ক জাগ্রত করার কাজ ক্রমাগত করতে থাকি। দেশের বিভিন্ন অংশে সমমনা লোকের ছোটো ছোটো চক্র গড়তে থাকে। অতঃপর আন্দোলনের প্রভাব পর্যালোচনা করার পর মনে হলো যে, এখন জামায়াতে ইসলামী গঠন করার এবং ইসলামী 'আন্দোলন সংগঠিতভাবে শুরু করার জন্যে পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে এবং দ্বিতীয় পদক্ষেপ গ্রহণের এ হচ্ছে উপযোগী সময়। তারই ভিত্তিতে এ সম্মেলন আহ্বান করা হয়েছে।"

জামায়াতে ইসলামীর কাজ

মাওলানা তাঁর উদ্বোধনী ভাষণে ইসলামী আন্দোলন ও অন্যান্য আন্দোলনের পার্থক্য বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বলেন ঃ

"মুসলমানদের মধ্যে সাধারণতঃ যেসব আন্দোলন অতীতে চলেছে, সেসব থেকে ইসলামী আন্দোলনের মৌলিক পার্থক্য কি, তাই সর্বপ্রথমে আমাদের ভালো করে জেনে রাখা দরকার।"

"প্রথমতঃ হয়তো ইসলামের কোনো অংশ বিশেষকে অথবা পার্থিব কোনো উদ্দেশ্যকে ভিত্তি করে এসব আন্দোলন পরিচালিত হয়। কিন্তু আমাদের এ আন্দোলন চলবে পরিপূর্ণ ইসলামকে নিয়ে।"

"দ্বিতীয়তঃ এদের দলীয় সংগঠন অন্যান্য দলগুলোর পদ্ধতিতে করা হয়েছে। কিন্তু আমরা সেই দলীয় সংগঠন ব্যবস্থা অবলম্বন করছি যা প্রথমে রসূলুল্লাহর [স] প্রতিষ্ঠিত দলের ছিলো।"

"তৃতীয়ত ঃ এসব দলে যখন কোনো লোক ভর্তি করা হয়, তখন এ ধারণার বশবর্তী হয়ে করা হয় যে, সে অবশ্য প্রকৃত মুসলমানই হবে। এর ফল এই হয়েছে যে, দলের সভ্য ও কর্মী থেকে আরম্ভ করে নেতা পর্যন্ত এমন অনেক লোক এসব দলে অনুপ্রবেশ করেছে যে, চরিত্রের দিক দিয়ে তারা মোটেই নির্ভরযোগ্য নয় এবং কোনো দায়িত্ব পালনের যোগ্যও নয়। কিন্তু আমরা আমাদের দলে কাউকে এ ধারণায় গ্রহণ করিনা বা করবনা যে, সে 'প্রকৃত মুসলমানই' হবে। বরঞ্চ সে যখন কালেমায়ে তাইয়েবার অর্থ, মর্ম ও তার দাবী জেনে-বুঝে তার উপর ঈমান আনার অঙ্গীকার করে-তখনই তাকে দলে গ্রহণ করি। যোগদান করে দলের সদস্য হয়ে থাকার জন্যে শর্ত হচ্ছে এই যে, ঈমান যেসব সর্বনিম্ন দাবী করে তা তাকে পূরণ করতে হবে। এভাবে ইনশাআল্লাহ মুসলমান জাতির মধ্য থেকে শুধুমাত্র সৎ ব্যক্তিই ছাঁটাই হয়ে এ দলে যোগদান করবে।"

"দুনিয়াতে জামায়াতে ইসলামীর জন্যে করার যে কাজ রয়েছে সে সম্পর্কে কোনো সীমিত ধারণা মনের মধ্যে পোষণ করবেননা।.......তার কাজের পরিধির মধ্যে রয়েছে পূর্ণ প্রসারতাস[৯] গোটা মানবজীবন। ইসলাম সকল মানুষের জন্য এবং যেসব বস্তুর সাথে মানুষের সম্পর্ক ইসলামের সাথেও সেসবের সম্পর্ক রয়েছে। অতএব ইসলামী আন্দোলন এক সর্বব্যাপী আন্দোলনের নাম।"

"যারা জামায়াতে ইসলামীতে যোগদান করবে তাদের প্রত্যেকের এ কথা ভালো করে বুঝে নেয়া দরকার যে, জামায়াতে ইসলামীর সামনে যে কাজ রয়েছে তা যেমন-তেমন কাজ নয়। দুনিয়ার গোটা ব্যবস্থা তাকে বদলিয়ে দিতে হবে। দুনিয়ার নীতি-নৈতিকতা, রাজনীতি-সংস্কৃতি, অর্থনীতি, সমাজনীতি-প্রতিটি বস্তু পরিবর্তন করে দিতে হবে। খোদা-দ্রোহিতার উপরে যে ব্যবস্থা দুনিয়ায় কায়েম রয়েছে, তা বদলিয়ে তা খোদার আনুগত্যের উপরে কায়েম করতে হবে। এ কাজে সকল শয়তানী শক্তির বিরুদ্ধে তার সংগ্রাম......প্রতিটি পদক্ষেপের পূর্বে প্রত্যেককে ভালো করে বুঝে নিতে হবে যে, সে কোন কন্টকময় পথে পা বাড়াচ্ছে।".....

সর্বশেষে মাওলানা বলেন ঃ

"আমি শুধুমাত্র একজন আহ্বায়ক ছিলাম। ভুলে যাওয়া সবক স্মরণ করিয়ে দেয়ার চেষ্টা করছিলাম এবং আমার সকল চেষ্টা-চরিত্রের লক্ষ্য এই ছিলো যে, একটা জামায়াতের ব্যবস্থাপনা হয়ে যাক। জামায়াত গঠিত হওয়ার পর আমি আপনাদেরই মতো একজন। ইসলামী জামায়াতের অধীনে আমি একজন। একটা অনৈসলামী জামায়াতের সভাপতি এবং প্রধানমন্ত্রীর পদমর্যাদা থেকে অনেক বেশী গৌরবের মনে করি-এ জামায়াতের খেদমত করা।"

জামায়াতের গঠনতন্ত্রের অনুমোদন

উদ্বোধনী ভাষণের পর মাওলানা মওদূদী (র) জামায়াতের গঠনতন্ত্রের খসড়া পাঠ করা শুরু করেন। গঠনতন্ত্রের ছাপানো কপি সকলকে পূর্বাহ্নেই পরিবেশন করা হয়। সম্মেলনে তার এক একটি শব্দ পড়া হয় এবং তার উপর আলোচনার সুযোগ দেয়া হয়। বিস্তারিত আলোচনার পর সন্ধ্যা নাগাদ কিছু সংশোধনীসহ গঠনতন্ত্র সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

গঠনতন্ত্র গৃহীত হওয়ার পর মাওলানা মওদূদী (র) সর্বপ্রথম দাঁড়িয়ে কালেমায়ে শাহাদাত পাঠ করে বলেন, "ভাইসব, আপনারা সাক্ষী থাকুন, আমি নতুন করে ঈমান আনছি এবং জামায়াতে ইসলামীতে শরীক হচ্ছি।"

তারপর সমবেত লোকদের মধ্যে সকলেই এক এক করে কালেমা পাঠ করে নতুন করে ঈমানের ঘোষণা করতে থাকেন। অধিকাংশ লোকের চোখ দিয়ে অশ্রু ঝরছিলো। অনেকে তো কান্নায় একেবারে ভেঙ্গে পড়ছিলেন। কালেমা উচ্চারণ করার সময় দায়িত্বের অনুভূতিতে সকলের মধ্যে কম্পন দেখা যাচ্ছিল। সকলের কালেমা শাহাদাত পাঠের পর মাওলানা মওদূদী (র) ঘোষণা করেন, এখন জামায়াত গঠিত হয়ে গেল। আসুন, আমরা সকলে রাব্বুল আলামীনের দরবারে দোয়া করি তিনি যেনো জামায়াতকে দৃঢ় ও অবিচল রাখেন এবং আমাদেরকে তাঁর কিতাব ও রসূলের সুন্নাত অনুযায়ী চলার তওফিক দান করেন।

জামায়াতের নামকরণ করা হলো-"জামায়াতে ইসলামী হিন্দ্।"

পরদিন অর্থাৎ তেসরা শাবান- ইং ২৭শে আগস্ট, সকাল আটটায় পুনরায় সম্মেলনের কাজ শুরু হয়। জামায়াত গঠিত হয়েছে কিন্তু তার আমীর নির্বাচন করা হয়নি। অন্যান্য আলোচনার পর আমীর নির্বাচন সম্পর্কে সদস্যদের সামনে মাওলানা মওদূদী (র) তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী প্রকাশ করে বলেন-

"আমীর নির্বাচনের ব্যাপারে আপনাদেরকে একটা বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখতে হবে যে, যে ব্যক্তি আমীর পদপ্রার্থী হবেন, তাঁকে কিছুতেই নির্বাচিত করা যাবেনা।.........ব্যক্তির প্রতি কোনো প্রকার সমর্থন ও প্রতিরক্ষার সকল প্রকার আবেগ অনুভূতি মন থেকে মুছে ফেলে নিরপেক্ষ মন নিয়ে দেখুন যে, আপনার জামায়াতে কে এমন ব্যক্তি আছেন-যার তাকওয়া, কুরআন ও সুন্নাহর জ্ঞান, দীনি দূরদর্শিতা, চিন্তা-ভাবনা ও কলাকৌশল এবং আল্লাহর পথে দৃঢ়তা ও অবিচলতা প্রভৃতির উপরে আপনি সবচেয়ে বেশী আস্থা স্থাপন করতে পারেন।"

এ কথা বলার পর আমীর নির্বাচন নিয়ে আলাপ-আলোচনা শুরু হয়। আলোচনায় তিন প্রকারের অভিমত ব্যক্ত করা হয়ঃ-

এক. কোনো আমীর নির্বাচন না করে কয়েক ব্যক্তিকে নিয়ে একটা কমিটি করা হোক যা ব্যবস্থাপনা ও পথনির্দেশনার কাজ করবে।

দুই: আপাততঃ কাউকে নির্দিষ্টকালের জন্যে অস্থায়ী আমীর নির্বাচিত করা হোক।

তিন. আমীর নির্বাচন এখনই করতে হবে এবং অনির্দিষ্টকালের জন্যে।

কোনো একটি অভিমত সম্পর্কে একমত হতে না পেরে নিম্নের সাত ব্যক্তিকে নিয়ে একটি কমিটি করা হলো ঃ-

মাওলানা মনযুর নোমানী, সাইয়েদ সিবগাতুল্লাহ, সাইয়েদ মুহাম্মদ জাফর ফুলওয়ারী, নাযীরুল হক মীরাঠী, মিস্ত্রী মুহাম্মদ সিদ্দীক, ডাঃ সাইয়েদ নাযীর আলী এবং মুহাম্মদ ইবনে আলী উলুভী।

কমিটি বিশদ আলাপ-আলোচনার পর সর্বসম্মতিক্রমে রুকনদের সামনে নিম্ন সুপারিশ পেশ করেন ঃ

বিনা আমীরে জামায়াত হতে পারেনা। অতএব মিয়াদ নির্দিষ্ট না করেই আমীর নির্বাচন করা হোক।

এ সুপারিশের ভিত্তিতে মাওলানা মওদূদী (র) সর্বসম্মতিক্রমে আমীর নির্বাচিত হন।

আমীর নির্বাচিত হওয়ার পর তাঁর প্রথম ভাষণে তিনি বলেন ঃ

আমি আপনাদের মধ্যে অধিকতর ইল্‌ম ও তাক্‌ওয়ার অধিকারী নই। কিন্তু যখন এ বোঝা আমার উপর চাপানো হয়েছে তখন আমি আল্লাহ তায়ালার কাছে দোয়া করব যেনো তিনি আমাকে দায়িত্ব পালনের তওফিক দান করেন। জামায়াতের শৃংখলা ও তার আমানতের আমি হিফাযত করবো। আশা করছি যে, যতোদিন আমি সঠিক পথে থাকবো আপনারা আমার সহযোগিতা করবেন এবং যদি আমি ভুল করি তাহলে আমাকে সংশোধন করে দেবেন। সর্বদা আমি যোগ্যতর লোকদের তালাশ করবো। এমন লোক পেলে আমিই প্রথমে তাঁকে সামনে এগিয়ে দেব। আমার জীবন ও মৃত্যু এ উদ্দেশ্যে এবং আমাকে এ পথেই চলতে হবে। আর কেউ চলুক বা না চলুক আমাকে এ পথেই চলতে হবে।

অবশ্য আমি এ জন্যে মোটেই প্রস্তুত নই যে, এ কাজ চালাবার জন্যে যদি অন্য কেউ এগিয়ে না আসে, তাহলে আমিও এগিয়ে আসবোনা। এ

আন্দোলন তো আমার জীবনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য। এ কাজের দায়িত্ব আর কেউ না নিলে আমাকেই নিতে হবে। কেউ আমার সহযাত্রী না হলে আমি একাই এ পথে চলবো। গোটা দুনিয়া ঐক্যবদ্ধ হয়ে আমার বিরোধিতা করলে আমি একাকী তার মুকাবিলা করতে দ্বিধাবোধ করবোনা।"

বক্তৃতার শেষে মাওলানা বলেন ঃ

"ফিকাহ ও কালাম শাস্ত্র সম্পর্কে আমি যা কিছু লিখেছি এবং ভবিষ্যতে লিখব-তা আমীরে জামায়াতের সিদ্ধান্ত হিসেবে গৃহীত হবে না। বরঞ্চ তা হবে আমার ব্যক্তিগত অভিমত। আমি চাইনা যে, এসব বিষয়ে আমার নিজের অভিমতকে অন্যান্যের উপর চাপিয়ে দেয়া হোক। আর না জামায়াতের পক্ষ থেকে এমন কোনো বাধানিষেধ আমার উপর আরোপ করা হোক যে, কোনো বিষয়ের উপর বুদ্ধিবৃত্তিক গবেষণা এবং তা প্রকাশের আমার স্বাধীনতা কেড়ে নেয়া হবে।"

"জামায়াতের রুকনদেরকে আমি খোদাকে সাক্ষী রেখে এ কথা বলছি যে, কেউ যেনো ফেকাহ ও কালাম সম্পর্কিত আমার কোনো উক্তি অন্যের কাছে চূড়ান্ত দলিল প্রমাণ হিসেবে পেশ না করেন। যিনি কুরআন-সুন্নাহর ইলমের অধিকারী তিনি তাঁর নিজের চিন্তা-গবেষণা ও তত্ত্বানুসন্ধানের ভিত্তিতে আমল করবেন এবং যাঁর এ সম্পর্কে কোনো জ্ঞান নেই তিনি যার প্রতি আস্থা রাখেন তাঁর চিন্তা-গবেষণা ও তত্ত্বানুসন্ধানের উপর আমল করবেন। এসব ব্যাপারে আমার সাথে দ্বিমত পোষণ করার এবং স্বাধীন মতামত ব্যক্ত করার পূর্ণ অধিকার সকলের থাকবে।"

এ বক্তৃতার পর মাওলানা জামায়াতে ইসলামীর প্রথম মজলিসে শূরার নির্বাচন সম্পন্ন করেন। নিম্নের ব্যক্তিগণ শূরা সদস্য নির্বাচিত হনঃ-

১. মাওলানা মনযুর নো'মানী, বেরেলী
২. মাওলানা আমীন আহসান ইসলাহী, সরাইমীর
৩. মাওলানা আবুল হাসান আলী নদভী, লাক্ষ্মৌ
৪. মাওলানা জা'ফর ফুলওয়ারী
৫. জনাব নাযীরুল হক, মিরাঠ
৬. মাওলানা মুহাম্মদ আলী কান্দালভী, শিয়ালকোট

৭. মাওলানা আব্দুল আযীয শার্কী, জলন্দর
৮. জনাব নসরুল্লাহ খান আযীয, লাহোর
৯. চৌধুরী মুহাম্মদ আকবর, শিয়ালকোট
১০. ডাঃ সাইয়েদ নাযীর আলী, এলাহাবাদ
১১. সিত্রী মুহাম্মদ সিদ্দীক
১২. মাওলানা আব্দুল জাব্বার গাজী
১৩. মাওলানা আতাউল্লাহ বোখারী [বাকেরগঞ্জ]
১৪. জনাব কামরুদ্দীন খান, লাহোর
১৫. মুহাম্মদ বিন আলী উলূভী
১৬. মুহাম্মদ ইউসূফ, ভুপাল

ঐ দিন অর্থাৎ ৪ঠা শা'বান ইং ২৮শে আগস্ট, মজলিসে শূরায় নির্বাচনের পর নিম্নলিখিত বিভাগগুলো খোলা হয় ঃ

শিক্ষা বিভাগ, কেন্দ্রীয় তরবিয়ত বিভাগ, প্রচার বিভাগ, সাংঠনিক বিভাগ, বায়তুলমাল, দাওয়াত ও তাবলীগ বিভাগ।

৫ই শা'বান মুতাবেক ২৯শে আগস্ট সম্মেলনের শেষ দিনে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ঃ-

● জামায়াতের বিরুদ্ধে ভ্রান্ত ধারণা দূর করার জন্যে ও দাওয়াত প্রসারের জন্যে পত্র-পত্রিকায় প্রবন্ধাদি লিখতে হবে।

● জামায়াতের রুকন সম্মেলন প্রতি বছর হবে।

● জামায়াতের যোগ্যতাসম্পন্ন লোকের একটি প্রতিনিধি দল বছরে অন্ততঃ একবার দেশের বিভিন্ন অঞ্চল সফর করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, আঞ্জুমান, দীনি মাদরাসা ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত জামায়াতের দাওয়াত পৌছাবার চেষ্টা করবে।

● একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করতে হবে।

আল্লাহ্‌র প্রিয় নবীগণ তাঁদের জাতির সামনে এবং শেষ নবী (সা) সমগ্র মানবজাতির সামনে যে দাওয়াত পেশ করেছেন তার অনুসরণেই জামায়াতে ইসলামী সমগ্র মানব জাতিকে আহ্বান জানায়, তা নিম্নরূপ ঃ

মানব সমাজের নিকটে সাধারণভাবে এবং মুসলমানদের নিকটে বিশেষভাবে ঃ

● জীবনের সকল ক্ষেত্রে খোদার দাসত্ব আনুগত্য ও শেষ নবীর নেতৃত্ব স্বীকার করো।

● বর্ণচোরা মনোভাব ও মুনাফেকী ত্যাগ করো এবং খোদার সাথে কাউকে শরীক করোনা।

● খোদাবিমুখ, অসৎ ও চরিত্রহীন লোককে সমাজের সকল নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব থেকে সরিয়ে দাও এবং ঈমানদার, চরিত্রবান ও যোগ্য লোকদের হাতে ক্ষমতা ন্যস্ত করো যেনো জীবন ঠিক খোদার পথে চালিত হয়।

এ দাওয়াত সত্য বলে বিশ্বাস করলে আমাদের সাথে শামিল হন। খোদার নিকট এর পুরস্কার অবশ্যই পাবেন। যে ব্যক্তি এ কাজে বাধা দেবে সে যেন খোদার নিকট জবাবদিহির জন্যে প্রস্তুত থাকে।

মোট কথা আল্লাহ্‌র নবীগণ যে মিশন নিয়ে দুনিয়ায় এসেছিলেন এবং যার পূর্ণাঙ্গ বিকাশ ঘটেছিল শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফার [সাঃ] দ্বারা, জামায়াতে ইসলামীও সে মিশন নিয়ে দাঁড়িয়েছে। অর্থাৎ মানবজীবনের প্রতিটি বিভাগে শিক্ষা দীক্ষায়, শিল্পকলা, সভ্যতা সংস্কৃতিতে, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক জীবনে, রাষ্ট্র পরিচালনায় ও যুদ্ধ-সন্ধিতে,ব্যবসা-বাণিজ্যে ও অফিস-আদালতে এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে একমাত্র খোদারই আনুগত্য করতে হবে–এই হচ্ছে জামায়াতে ইসলামীর লক্ষ্য। একেই বলা হয়েছে "ইকামতে দীন" বা আল্লাহ্‌র দীন ইসলামের পূর্ণ প্রতিষ্ঠা।

আমীরে জামায়াতের সাংগঠনিক ও দাওয়াতী সফর

অক্টোবর মাসে মাওলানা মওদূদী, আমীর, জামায়াতে ইসলামী হিন্দ তাঁর প্রথম সংগঠন ও দাওয়াতী সফরে বের হন। উদ্দেশ্য ছিলো জামায়াতের বিরুদ্ধে ভ্রান্ত ধারণা দূরীকরণ, বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দান এবং জামায়াতের প্রচার ও প্রসারের জন্যে অতিরিক্ত পদক্ষেপ গ্রহন। এ উদ্দেশ্যে তিনি দিল্লী, আলীগড়. এলাহাবাদ, সরাইমীর, লাক্ষ্ণৌ ও বেরেলী সফর করেন। বহু লোকের সাথে তিনি মতবিনিময় করেন, বিভিন্ন সন্দেহাদি দূর করেন।

জামায়াতী জীবনের এক বছর অতীত হতে না হতেই বিরোধিতা শুরু হয়। চিন্তা করলে অবাক হতে হয় যে, যে মহলের পক্ষ থেকে সর্বাগ্রে এবং সবচেয়ে বেশী সমর্থন ও সাহায্য সহযোগিতার আশা ছিলো–সে মহলটিই বিরোধিতায় মেতে উঠলো। এ মহলটি ছিলো ওলামায়ে কেরামের, ইকামাতে দীনের সবচেয়ে বেশী দায়িত্বশীল। জামায়াতে ইসলামী দীনের যে সার্বিক দাওয়াত নিয়ে ময়দানে নেমেছে–তার বিরোধিতা যদি নাস্তিক, কমিউনিষ্ট, ধর্মহীন পাশ্চাত্য সভ্যতার পূজারীগণ করে তাহলে তার কারণ তো সহজেই বুঝতে পারা যায়, কিন্তু তারা কেউ বিরোধিতা করলোনা, বিরোধিতায় নামলো আলেম সমাজের একটা অংশ।

আমীরে জামায়াত তাদের সকল অভিযোগের জবাবে বলেন, দাওয়াত, লক্ষ্য, কর্ম পদ্ধতি ও কর্মসূচীতে কুরআন-সুন্নাহ্‌র দৃষ্টিতে ভুল থাকলে তা যেনো ধরিয়ে দেয়া হয়, সংশোধন করা হবে। আর যদি আমীরে জামায়াতের প্রতি কোনো ব্যক্তিগত অসন্তোষ আপত্তি থাকে তাহলে তা জামায়াতের পাল্লায় না ফেলে তাঁর ব্যক্তির মধ্যেই সীমিত রাখা উচিত।

সিদ্ধান্ত ছিলো যে, বিয়াল্লিশ সালের মার্চ মাসে রুকন সম্মেলন হবে। কিন্তু যুদ্ধকালীন পরিস্থিতির জন্যে তা সম্ভব ছিলোনা বলে ফেব্রুয়ারী মাসে মজলিসে শূরার জরুরী অধিবেশন আহ্বান করা হয়। ২৬, ২৭, ও ২৮শে ফেব্রুয়ারী শূরার বৈঠক চলে এবং আলোচনার পর সদস্যগণ অনুভব করেন যে, জামায়াতে এমন কিছু লোক প্রবেশ করেছেন–যাঁরা জামায়াতকে সঠিকভাবে বুঝতে পারেননি এবং জামায়াতের দাবী অনুযায়ী নিজেদেরকে

বদলাতে পারেননি। রুকনের স্থানে এসব লোককে আনার জন্যে প্রয়োজন ছিলো সাহিত্য অধ্যয়ন ও চারিত্রিক প্রশিক্ষণের। খোদার সাথে কৃত ওয়াদা তাদেরকে স্মরণ করিয়ে দেয়া দরকার ছিলো। উপরন্তু মুহাসাবায়ে নফ্স, কুরআন-হাদীস অধ্যয়ন এবং নামাযের বিশেষ ব্যবস্থাপনার জন্যে হেদায়েত দেয়ার প্রয়োজন ছিলো। সে জন্যে সিদ্ধান্ত হয় যে, স্থানীয় আমীরগণ প্রতিবছর অন্ততঃপক্ষে দু'এক মাসের জন্যে কেন্দ্রে এসে আমীরে জামায়াতের সাথে অবস্থান করবেন এবং তাঁদের সহকর্মীদের তাঞ্জীম ও তায্কিয়ার জন্যে প্রয়োজনীয় তরবিয়ত গ্রহণ করবেন।

এটাও সিদ্ধান্ত হয় যে, জামায়াতের মধ্যেকার কিছু প্রতিভাসম্পন্ন লোক স্থায়ীভাবে কেন্দ্রে চলে আসবেন যাতে করে কেন্দ্রীয় পর্যায়ে ইসলামী বিপ্লবের জন্যে একটি টীম তৈরী হতে পারে। তাঁরা কেন্দ্রে অবস্থান করে ইসলামী আন্দোলনের তাত্ত্বিক ও বাস্তব নেতৃত্ব দানের তরবিয়তও গ্রহণ করবেন। সেই সাথে আন্দোলনের জন্যে জরুরী সাহিত্যও তৈরী করবেন।

জামায়াত দপ্তর স্থানান্তর

জামায়াতের জন্যে নতুন কেন্দ্রীয় অফিসের তালাশ করা হচ্ছিল। এ অবস্থায় চৌধুরী নিয়ায আলীর অনুরোধে পুনরায় পাঠানকোটে অফিস স্থানান্তরের সিদ্ধান্ত হয় এবং তদনুযায়ী ১৫ই জুন এ কাজ সম্পন্ন করা হয়।

মাওলানার বিশেষ হিদায়াত

জামায়াতে ইসলামীর কর্মতৎপরতার শুরু হওয়ার পর মাওলানা বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে কর্মীদের উদ্দেশ্যে বিশেষ বিশেষ হিদায়াত দান করেন। তার দু'একটি নিম্নে দেয়া হলো ঃ

"রুকনদের কাছে আমাদের দাবী এই যে, তাঁরা যে অবস্থায় এবং যে কাজেই থাকুক না কেন? আপাদমস্তক ইসলামের প্রতীক হবেন এবং তার শিক্ষার পূর্ণ অনুসরণ করবেন। তাঁরা ঘরে থাকুক, হাটে বাজারে থাকুক অথবা ব্যবসা বাণিজ্যে প্রত্যেক স্থানে যেনো এ অনুভূতি থাকে যে, তারা মুসলমান এবং প্রত্যেকটি কাজ ও পদক্ষেপের জবাবদিহি খোদার কাছে করতে হবে।"

"যদি আপনাদেরকে সামনে অগ্রসর হয়ে জনগণের মধ্যে কাজ করতে হয় এবং আন্দোলনকে গ্রামে গঞ্জে, কৃষক শ্রমিক এবং সাধারণ নাগরিকদের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে হয়, তাহলে জনগণের নিকটতর হবার চেষ্টা করুন। কাজ করার জন্যে তাদের মধ্য থেকেই কর্মী তৈরী করুন......আপন আপন বস্তি ও পল্লীর জনগণের সাথে সম্পর্ক বাড়ান, তাদের দৈনন্দিন জীবনের ও কাজকর্মের দরদ দিয়ে খোঁজ খবর রাখুন......তাদের সাথে আচরণ করুন ভালোবাসা ও সহানুভূতির সাথে এবং দেখুন সমান চোখে। তাদের বিপদ আপদে পাশে গিয়ে দাঁড়ান এবং তাদের খাঁটি বন্ধু ও শুভাকাঙ্খী হয়ে যান।"

তাঁর এ উক্তি গুলো এ কথারই প্রমাণ যে, তিনি ছিলেন সত্যিকার মানব দরদী ও সমাজ সংস্কারক এবং জামায়াত কর্মীদের মধ্যে এসব গুণাবলী সৃষ্টির চেষ্টা করেন।

মাওলানার অসাধারণ কর্মব্যস্ত জীবন

১৯৩৯ এর ফেব্রুয়ারীতে পাঠানকোট থেকে মাওলানার লাহোর স্থানান্তরিত হওয়ার পর, লাহোরের আঞ্জুমানে হিদায়াতে ইসলাম কর্তৃপক্ষ মাওলানার লাহোর অবস্থানের কথা জানতে পেরে তাঁদের ইসলামীয়া কলেজে ইসলামীয়াতের অধ্যাপক হিসেবে কাজ করার জন্যে তাঁকে অনুরোধ জানান। মাওলানা তাঁদের অনুরোধ রক্ষা করেন এবং সেপ্টেম্বর থেকে অধ্যাপনার কাজ শুরু করেন। হপ্তায় তিনদিন মাওলানা ইসলামীয়াতের উপর জ্ঞানগর্ভ ভাষণ দিতেন। হাবীবিয়া হলে লাউড্ স্পীকার লাগানো হতো এবং কলেজের সকল ছাত্র ও শিক্ষক তন্ময় হয়ে তাঁর ভাষণ শুনতেন। তার ফলে বহুসংখ্যক লোক ইসলামী জীবন যাপন অবলম্বন করেন। কুরআন হাদীস ও ফেকাহ্ শাস্ত্রে বিশেষজ্ঞ এবং পাকিস্তানের শরীয়ত হাইকোর্টের বর্তমান বিচারপতি মালিক গোলাম আলী ও খ্যাতনামা সাংবাদিক ও সাহিত্যিক চৌধুরী গোলাম জীলানী, পুরোপুরি মাওলানার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। মাওলানা এক বছর যাবত বিনা পারিশ্রমিকে ইসলামীয়া কলেজে অধ্যাপনার কাজ করেন। এ সময়টা ছিলো তাঁর অসাধারণ কর্মব্যস্ততার সময়। একদিকে তিনি লাহোর, আলীগড়, লাক্ষ্মৌ, নাদ্ওয়া, আযমগড়, অমৃতসর প্রভৃতি স্থানে সফর করেন এবং লাহোরের বিভিন্ন দীনি সংস্থার আমন্ত্রণে বিভিন্ন বিষয়ের উপর জ্ঞানগর্ভ

ভাষণ দান ও তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধাদি পাঠ করেন। অপরদিকে অসম্ভব ধরনের লেখাপড়ার কাজ করেন। অবস্থা এমন ছিলো যে, এশার নামাযের পর পড়া ও লেখার কাজ শুরু করতেন-এবং ফজর পড়ে কিছু সময় বিশ্রাম করতেন। রমযান মাসে তারাবীহ্ পড়ে কলম হাতে নিয়েছেন, বেগম সাহেবা এসে বলেছেন-সেহ্‌রী তৈরী হয়েছে প্রথমে খেয়ে নিন। এ ধরনের কঠোর ও অমানুষিক পরিশ্রমের ফলে তিনি তাঁর স্বাস্থ্য নষ্ট করেন এবং ভগ্নস্বাস্থ্য হয়েই তাঁকে মৃত্যুর পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত দীন ও মিল্লাতের খিদমত আঞ্জাম দিতে হয়েছে।

মজলিসে শূরার জরুরী বৈঠক

বিয়াল্লিশের শেষার্ধে জামায়াতের বিরুদ্ধে এক গোপন প্রচারণা শুরু হয় এবং তার উদ্যোগ নেয় ভেতরের লোকেরাই। প্রকাশ্যে শরিয়তের যুক্তি প্রমাণ পেশ করে বিরোধিতার পরিবর্তে গোপনে যুক্তিহীন ও অবান্তর অভিযোগ ছড়ানো হতে থাকে। মাওলানার বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিলো তাক্‌ওয়া পরহেয্‌গারীর। মাওলানার লেবাস পোষাক, ঘোর দোর হামেশা থাকতো পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, তক্‌তকে, ঝক্‌ঝকে। চিরাচরিত তাক্‌ওয়া পরহেয্‌গারীর বিকৃত মানসিকতা সম্পন্ন কিছু লোক এটাকে তাক্‌ওয়ার খিলাফ মনে করে অপপ্রচার শুরু করেন। প্রকাশ্যে বলাও তাঁদের সাহস ছিলোনা এবং তার পেছনে কোনো যুক্তিও ছিলোনা। কিন্তু গোপন প্রচারণা মানুষের মনে বড়ো দাগ কাটে। মাওলানা মন্‌যূর নো'মানীর মতো একজন আলেমে দীন জামায়াতের কাজে অনীহা প্রকাশ করেন তার কোনো সুস্পষ্ট কারণও তিনি বলেননি। তথাপি জামায়াত এক বিরাট সমস্যার সম্মুখীন হয়। অক্টোবরে দু'দিনের জন্যে দিল্লীতে মজলিসে শূরার জরুরী বৈঠক ডাকা হয়। ১৫ জনের মধ্যে ১৩ জন উপস্থিত হন।

মাওলানা নিম্নের তিনটি বিকল্প প্রস্তাব শূরার সামনে রাখেন ঃ

এক. আমীরে জামায়াত পদত্যাগ করবেন এবং অন্য কাউকে আমীর নির্বাচিত করা হবে।

অথবা

দুই. তিন-চার জনের একটা প্রেসিডিয়াম গঠন করে কাজ চালানো হবে।

অথবা

তিন. জামায়াত ভেঙ্গে দেয়া হবে–এবং প্রত্যেকে ব্যক্তিগতভাবে কাজ করবে।

ইমারতের জন্যে বিকল্প কোনো যোগ্য লোক না থাকায় প্রথম প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করা হয়। দ্বিতীয় প্রস্তাবটিও এ জন্যে বাতিল করা হয় যে, তা শরীয়তের দিক দিয়েও জায়েয নয় এবং বাস্তবে সম্ভবও নয়।

মতভেদকারী স্বল্পসংখ্যক লোক তৃতীয় প্রস্তাবের সপক্ষেই তাঁদের আগ্রহ প্রকাশ করেন। কিন্তু অবশিষ্ট প্রায় সকলে বলেন যে, জামায়াত ভেঙ্গে দেয়ার পরিবর্তে তাঁদেরই জামায়াত ত্যাগ করা বাঞ্ছনীয়। কিছু লোক মতভেদ পরিহার করে জামায়াতের সাথে একাত্ম হয়। চারজন একমত হতে না পেরে জামায়াত পরিত্যাগ করেন। তাঁরা হলেন–[১] মাওলানা মন্যূর নো'মানী, সম্পাদক; আল্ ফুরকান, বেরেলী; [২] মাওলানা সাইয়েদ মুহাম্মদ জা'ফর, ফুলওয়ারভী, কাপূরথালা; [৩] কামুরুদ্দীন খান, লাহোর; এবং [৪] জনাব আতাউল্লাহ্ খান, পটুয়াখালী–বরিশাল।

তারপর কোনো কোনো মহল থেকে জামায়াত বিরোধিতা থাকলেও, যে বিপদের মেঘ জমে উঠছিলো তা কেটে গেলো।

জামায়াতের প্রাথমিক সাংগঠনিক স্তর

আল্লাহ্ তায়ালার খাস্ রহমতে সকল বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করে জামায়াতের অগ্রগতি চলতে থাকে। বিভিন্ন স্থানে সম্মেলন, কাজের রিপোর্ট গ্রহণ ও পর্যালোচনা, কর্মীদের ব্যাপক তরবিয়ত ক্রমবর্ধমান আকারে চলতে থাকে।

সেক্রেটারী জেনারেল [কাইয়েম]

কাজের ব্যাপকতা লক্ষ্য করে একজন সেক্রেটারী জেনারেলের [কাইয়েম] প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করা হয়। এ কাজের জন্যে ১৭ই এপ্রিল ১৯৪৪ থেকে মিয়া তুফাইল মুহাম্মদকে পরীক্ষামূলকভাবে এক বছরের জন্যে নিয়োগপত্র দেয়া হয়। তিনি তাঁর যোগ্যতা প্রমাণ করেন এবং তখন থেকে ১৯৭২ সাল পর্যন্ত এ সুদীর্ঘ সময় দক্ষতা সহকারে এবং দীনের

উপর পাহাড়ের মতো অটল অবিচল থেকে তাঁর দায়িত্ব পালন করেন। কি জেলে, কি জেলের বাইরে, কি বাড়িতে, কি সফরে তিনি ছিলেন মাওলানার ছায়াস্বরূপ। এখন তিনি জামায়াতে ইসলামী পাকিস্তানের আমীর।

প্রথম নিখিল ভারত জামায়াতে ইসলামী রুকন সম্মেলন

১৯৪৫ সালের ১৯শে এপ্রিল থেকে ২০শে এপ্রিল পর্যন্ত পাঠানকোট সমগ্র ভারতে জামায়াত রুকনদের তিনব্যাপী এক সম্মেলন হয়। আমীরে জামায়াতের উদ্বোধনী ভাষণের পর জামায়াতের সামগ্রিক কাজ কর্মের রিপোর্ট পেশ করেন মিয়া তুফাইল মুহাম্মদ সাহেব। সারাদেশে ৭৫০ জন রুকনের পরীক্ষা নিরীক্ষা করার পর ৪৫০ জনের কিছু কম টিকে যান। সারাদেশের মকামী জামায়াতের সংখ্যা ৫৩। সম্মেলনে কাজের ব্যাপক পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয় এবং 'দারুল আরুবা' নামে একটি বিভাগ খুলে তার দায়িত্ব মাওলানা মাসৃউদ আলম নদৃভীর উপর অর্পিত হয়। এ বিভাগের কাজ হলো আরব দেশগুলোতে জামায়াতের দাওয়াত প্রচার ও জামায়াতের সাহিত্য আরবী ভাষায় অনুবাদ করা।

দ্বিতীয় নিখিল ভারত সম্মেলন ১৯৪৬

নতুন পরিকল্পনা অনুযায়ী জামায়াতের কাজ দ্রুতগতিতে বাড়তে থাকে। দ্বিতীয় নিখিল ভারত জামায়াতে ইসলামী রুকন সম্মেলন ১৯৪৬ সালের ৫ই এপ্রিল থেকে ইলাহাবাদে শুরু হয় এবং ৭ই এপ্রিল সমাপ্ত হয়। এ সম্মেলনের রিপোর্ট অনুযায়ী দেশের রুকন সংখ্যা ছিলো ৪৮৬ এবং রুকন প্রার্থীর সংখ্যা ২২৪। বাংলা প্রদেশেরও দু'জন রুকন গণনা করা হয়। [তাদের নামধাম সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি]। ভারত বিভাগের পূর্বে আর কোনো নিখিল ভারত সম্মেলন করা সম্ভব হয়নি। তবে দেশকে কয়েক অংশে বিভক্ত করে এক এক অংশের সম্মেলন এক এক স্থানে হয়। সম্মেলনে একটি করে মুক্ত অধিবেশন বা জনসভার প্রোগ্রামও রাখা হতো যেখানে বাইরের বিশিষ্ট লোককে আমন্ত্রণ জানানো হতো।

পাটনা সম্মেলন [১৯৪৭]

১৯৪৭ এ ২৫–২৬শে এপ্রিল পূর্ব ভারতের সম্মেলন পাটনায় অনুষ্ঠিত হয়। কতিপয় সংকীর্ণমনা আলেম জামায়াতের বিরোধিতা করলেও শিক্ষিত

সুধী সমাজ জামায়াতকে শ্রদ্ধার চোখেই দেখতো। তার কারণ জামায়াত কর্মীদের উন্নত চরিত্র, তাদের মধুর আচার ব্যবহার, তাদের যুক্তিপূর্ণ বলিষ্ঠ বক্তব্য, তাদের অতুলনীয় ত্যাগ ও কোরবানী।

উক্ত পাটনা সম্মেলনের বৈশিষ্ট্য এই যে, দ্বিতীয় দিনে বাদ মাগরিব জনসভায় মাওলানা আমীন আহসান ইসলাহী বক্তৃতা করাকালে মিঃ গান্ধী কয়েকজন মহিলাসহ সভায় হাযির হন। মহিলাদেরকে পর্দার আড়ালে মহিলাদের স্থানে বসিয়ে দেয়া হয় এবং মিঃ গান্ধীকে বসতে দেয়া হয় অন্যান্যের সাথে মাটিতে ফরাশের উপরে। মিঃ গান্ধী ইসলাহী সাহেবের পূর্ণ বক্তৃতা শুনে সন্তোষ প্রকাশ করেন। বক্তৃতার আলোচ্য বিষয় ছিলো-"জামায়াত ইসলামী কি ও কেন?"

জামায়াতের সাহিত্য সৃষ্টি

এ সময় পর্যন্ত মাওলানা মওদূদী আন্দোলনের উপযোগী যে সাহিত্য রচনা করেন তা নিম্নরূপ ঃ

১৯৩৩	১.	ইসলামী তাহ্যীব আওর উস্‌কে অসূল ও মুবাদী
	২.	মাস্‌লায়ে জাবর ও কাদর
১৯৩৪	১.	তান্‌কীহাত
	২.	তাফ্‌হীমাত
১৯৩৫	১.	হকুকুয্‌ যাওজাইন
	২.	ইসলাম আওর যব্‌তে বেলাদাত
১৯৩৬-৩৭	১.	দীনিয়াত
	২.	সূদ
	৩.	পর্দা
১৯৩৮		খুৎবাৎ
১৯৩৯	১.	মুসলমান আওর মওজুদা সিয়াসী কাশমকাশ-[১৯৩৭ সালে শুরু করে ১৯৩৯ সাল পর্যন্ত তিন খন্ডে সমাপ্ত]
	২.	ইসলামকা নায্‌রিয়ায়ে সিয়াসী
	৩.	ইসলামী ইবাদাত পর তাহ্‌কীকী নযর

১৯৪০ ১. তাজ্‌দীদ ও ইহ্‌ইয়ায়ে দীন
২. ইসলামী হুকুমত কিস্‌তরাহ্‌ কায়েম হুতি হ্যায়?
৩. এক আহম ইস্তেফ্‌তা

১৯৪১ ১. কুরআন কি চার বুনিয়াদী ইস্তেলাহে
২. ইসলাম আওর জাহেলিয়াত
৩. নয়া নিযামে তা'লীম
৪. ইনসানকা মায়াশী মস্‌লা আওর উস্‌কা হাল্‌

১৯৪২ সালামতিকা রাস্তা

১৯৪৩ ১. দীনে হক
২. মুরতাদকি সাযা ইসলামী কানুনমে

১৯৪৪ ১. ইসলামকা আখ্‌লাকী নোক্‌তায়ে নযর
২. হাকীকতে শির্ক [আমীন আহ্‌সান ইসলামী]

১৯৪৫ ১. হাকীকাতে তাওহীদ
২. তাহ্‌রিকে ইসলামী কি আখলাকী বুনিয়াদেঁ
৩. দাওয়াতে ইসলামী আওর উস্‌কে মুতালিবাত

১৯৪৬ ১. শাহাদাতে হক
২. দাওয়াতে দীন আওর উস্‌কা তারিকেকার

১৯৪৭ ১. জামায়াতে ইসলামী কি দাওয়াত
২. বানাও আওর বিগাড়
৩. হাকীকাতে তাক্‌ওয়া
৪. হিন্দুস্তানমে তাহ্‌রিকে ইসলামীকা আয়েন্দা লায়েহায়ে আমল।

১৯৪৭ এ ভারত বিভাগের প্রাক্কালে দেশের চার অংশে চারটি গুরুত্বপূর্ণ রুকন সম্মেলন হয় যথা–১৭-১৮ই এপ্রিল দক্ষিণ-পশ্চিম অংশে টুং নামক স্থানে, ২৫–২৬ এপ্রিল পাটনা ও মাদ্রাজে এবং ৯-১০মে পাঠানকোটে। পাটনা বাদ অন্যান্য সম্মেলনগুলোতে মাওলানা অংশগ্রহণ করেন। ভারতীয় মুসলমানদের ভবিষ্যৎ কর্মসূচীর উপর মাওলানা গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ দেন।

ভারত বিভাগের তিন মাস পূর্বে পাঠানকোটে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে মাওলানা যে গুরুত্বপূর্ণ ভাষণদান করেন তার বিষয়বস্তু ছিলো 'ভাঙা ও গড়া' যা পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। এ সম্মেলনে বহু হিন্দু ও শিখ মনোযোগ সহকারে মাওলানার ভাষণ শুনে সন্তোষ প্রকাশ করেন।

ভারত বিভাগ

১৯৪৭ এর ৩রা জুন বৃটিশ সরকারের পক্ষ থেকে ভারত বিভাগের ঘোষণা করা হয় এবং ১৫ই আগষ্ট থেকে তা কার্যকর হয়। ৩রা জুন থেকে ১৫ই আগষ্ট পর্যন্ত সময়কাল ছিলো ভারতীয় মুসলমানের জন্যে এক হৃদয়বিদারক কারবালা। এ সময়ে মুসলমানের তাজা খুনে নদী বয়ে যায়। তাদের কোটি কোটি টাকার ধন সম্পদ লুণ্ঠিত হয়, হাজার হাজার মুসলমান মহিলা ও বালিকা হিন্দু ও শিখদের দ্বারা অপহৃত হয়।

দেশ বিভাগের সময় দারুল ইসলাম

ভারতে অবস্থিত পাঠানকোট দারুল ইসলামের উপরেও বার বার হামলা হয়। কিন্তু মাওলানার দূরদর্শিতা, তাঁর সূক্ষ্ম ষ্ট্রাটেজী, সাহসিকতা, প্রতিরক্ষার বিজ্ঞতাপূর্ণ পরিকল্পনা, তদুপরি একজন সুদক্ষ ও রণকুশলী সিপাহসালারের ন্যায় অস্ত্রসজ্জায় সজ্জিত হয়ে দিন রাত প্রহরার প্রতি তাঁর সজাগ দৃষ্টি হাজার হাজার নারী পুরুষ শিশুর জীবন রক্ষা করে। সকলকে কয়েক দলে বিভক্ত করে সকলের শেষে তিনি পাকিস্তান গমন করেন।

জামায়াতে ইসলামী দুই ভাগে বিভক্ত

দেশ বিভাগের ফলে জামায়াতে ইসলামী দু'ভাগে বিভক্ত হয় জামায়াতে ইসলামী পাকিস্তান ও জামায়াতে ইসলামী হিন্দ্।

এখন থেকে উভয় জামায়াত সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে তাদের পৃথক কর্মসূচীতে ও কর্মপদ্ধতি গ্রহণ করে। বিভাগপূর্ণ কালে নিখিল ভারত জামায়াতের মোট রুকন সংখ্যা ছিলো ৬২৫। তার মধ্যে ২৪০ জন ভারতে রয়ে যান এবং ৩৮৫ জন নিয়ে জামায়াতে ইসলামী পাকিস্তানের কাজ শুরু হয়।

মাওলানা মওদূদী সর্বশেষ কাফেলার সাথে ৩০শে আগস্ট বেলা ৮টায় দারুল ইসলাম ত্যাগ করেন। পিছনে ফেলে আসেন তর্জুমানুল কুরআনের বিরাট ভান্ডার, কেন্দ্রীয় জামায়াতের মূল্যবান গ্রন্থাবলী যার তৎকালীন মূল্য ১১,১১৮/.......টাকা চার আনা, মাওলানার নিজস্ব লাইব্রেরী যার মধ্যে বহু দুষ্প্রাপ্য ও বহু মূল্যবান গ্রন্থাদি ছিলো দারুল ইসলামের গোটা লাইব্রেরী ও মূল্যবান ফার্নিচার।

মাওলানা ও তাঁর সঙ্গী-সাথী মুহাজিরদের পূনর্বাসনের কোনো ব্যবস্থা সরকার পক্ষ থেকে করা হয়না। মাওলানাকে অনেকে বলেন, কোনো বাড়ি এলট্‌মেন্টের জন্যে সরকারকে অনুরোধ জানাতে। কিন্তু তিনি তা করতে অস্বীকৃতি জানান। এক মাসকাল ইউনিভার্সিটি গ্রাউন্ডে ছোট ছোট তাবুতে বাস করার পর ইছড়ায় কয়েকটি বাড়ি ভাড়া করে সেখানে সকলে স্থানান্তরিত হন। ইছড়াতে মাওলানার বসবাসও জামায়াতের অফিসের জন্যে একটি বাড়ি নেয়া হয়–সেখানে তিনি তাঁর বাকী সমস্ত জীবন কাটিয়ে দেন। এখানেই তিনি অন্তিম শয্যায় শায়িত।

একটি কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, ১৯৪১ এ জামায়াত গঠনের পর বিভিন্ন মহল এমনকি মাওলানার প্রতি শ্রদ্ধাশীল এমন অনেকে প্রশ্ন করেন, যখন পাকিস্তান আন্দোলন চলছে তখন একটি নতুন দল গঠনের কি প্রয়োজন ছিলো? তার জবাবে মাওলানা বলেন, পাকিস্তান আন্দোলনের দু'টি ফলের মধ্যে যে কোনো একটি হতে বাধ্য। অর্থাৎ হয় পাকিস্তান হবে, অথবা হবেনা। যদি না হয় তাহলে ভারতের দশ কোটি মুসলমান এমন এক নৈরাশ্যের শিকার হবে যে, তারা তাদের জাতীয় স্বাতন্ত্র হারিয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠ জাতির মধ্যে একাকার হয়ে যাবার আশংকা রয়েছে। আর যদি পাকিস্তান হয় তাহলে তা ইসলামী রাষ্ট্র না হয়ে তুরস্কের মতোই একটা ধর্মহীন রাষ্ট্রে পরিণত হবে এবং অর্ধ সংখ্যক মুসলমান যারা ভারতে রয়ে যাবে তাদের সত্যিকার নেতৃত্ব দেবার কেউ থাকবেনা। পাকিস্তানকে ইসলামী রাষ্ট্রে পরিণত করার সংগ্রামের জন্যে এবং ভারতের মুসলমানদের ঈমান, আকীদাহ ও আমল অক্ষুন্ন রাখার জন্যে একটি ইসলামী আদর্শবাদী দলের অনিবার্য প্রয়োজন। জামায়াত ইসলামীই সেই দল। পরবর্তীকালে পাকিস্তান ও ভারতের ঘটনা প্রবাহ মাওলানার এ ভবিষ্যতবাণী অক্ষরে অক্ষরে সত্যে পরিণত করেছে।

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর পরই ইসলামী জীবন ব্যবস্থার বিশদ ব্যাখ্যার জন্যে সরকারের পক্ষ থেকে মাওলানাকে আমন্ত্রণ জানানো হয় এবং তার জন্যে তাঁকে রেডিও পাকিস্তানের মাধ্যমে ভাষণ দেয়ার সুযোগ দেয়া হয়। মাওলানা কয়েক কিস্তিতে ইসলামী ইবাদাত ইসলামের রাজনৈতিক ব্যবস্থা, সমাজ ব্যবস্থা, নৈতিক ব্যবস্থা, অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রভৃতির উপর আলোকপাত করেন। অতঃপর তিনি লাহোর আইন কলেজেও কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ দান করেন। এসব ভাষণে তিনি ইসলামী আইন ও শরীয়তেরও বিশদ ব্যাখ্যাদান করেন।

৬ই জানুয়ারী ১৯৪৮

১৯৪৮ এর ৬ই জানুয়ারী মাওলানা লাহোর আইন কলেজের এক সমাবেশে 'ইসলামী আইনের বুনিয়াদের' উপর দীর্ঘ ভাষণ দান করেন।

নতুন দেশ পরিচালনার দায়িত্ব যাদের উপর তাঁরা যে পাকিস্তানকে একটি ধর্মহীন রাষ্ট্রে পরিণত করতে চান, তার আলামত সুস্পষ্ট হতে থাকে। অতএব ৬ই মার্চ করাচীর জাহাঙ্গীর পার্কে অনুষ্ঠিত এক বিরাট জনসভায় মাওলানা ৪ দফা দাবী পেশ করেন ঃ

● রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব একমাত্র আল্লাহ্‌র

● সকল আইনের উৎস হবে কুরআন ও সুন্নাহ

● সকল ইসলাম বিরোধী আইন রহিত করতে হবে।

● শরীয়ত নির্ধারিত সীমারেখার মধ্যেই সরকার তার ইখতিয়ার প্রয়োগ করতে পারবে।

মাওলানার গ্রেফতারী

ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থার বিরোধী মহল মাওলনার এসব বক্তৃতা বিবৃতিতে কান খাড়া করে এবং তাঁর বিরুদ্ধে জল্পনা কল্পনা চলতে থাকে। তারপর কায়েদে আযমের মৃত্যুর পর পরই ৪ঠা অক্টোবর বিভিন্ন অজুহাতে মাওলানাকে নিরাপত্তা আইনে গ্রেফতার করা হয়।

আদর্শ প্রস্তাব ১২ই মার্চ, ১৯৪৯

পাকিস্তানে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলন বন্ধ করার জন্যেই যে মাওলানাকে কারাবন্দী করা হয় তাতে আর কোনো সন্দেহের অবকাশ রইলো না। কিন্তু তাতে করে ইসলামী আন্দোলন বন্ধ হওয়ার পরিবর্তে সারাদেশে ছড়িয়ে পড়ে। এ ৪-দফা আন্দোলন শুধু জামায়াত কর্মীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনি, বরঞ্চ ওলামায়ে কেরামও ইসলামী জনতা এ আন্দোলনের সাথে একাত্ম হয়ে সরকারকে নতি স্বীকার করতে বাধ্য করে। পাকিস্তান গণ পরিষদ তাই ১৯৪৯ সালের ১২ই মার্চ ঐতিহাসিক আদর্শ প্রস্তাব গ্রহণ করে।

একদিকে মাওলানার বিরুদ্ধে নতুন নতুন উদ্ভট ও ভিত্তিহীন অভিযোগ উত্থাপিত এবং ছ'মাস পর পর কারাজীবনের মেয়াদ বর্ধিত হতে থাকে। মাওলানার কারাজীবন ইসলামী আন্দোলনের কণামাত্র ক্ষতি করতে পারেনি–বরঞ্চ আন্দোলনের অগ্রগতি ত্বরান্বিত ও দ্রুততর করেছে।

অপরদিকে মাওলানা মওদূদী দুনিয়ার কোলাহলমুক্ত হয়ে নীরবে ও নিশ্চিন্তে তাফহীমূল কুরআনের প্রথম খন্ড সমাপ্ত করেন, সুদ গ্রন্থের দ্বিতীয় খন্ড লেখেন এবং অন্যান্য গ্রন্থাদি পূনঃপরীক্ষা [Revise] করেন। জালেমের জুলুম চিন্তা ও গবেষণার ময়দানে কাজের ধারাবাহিকতা বন্ধ করতে পারে না। ইসলামী আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা ও অগ্রদূত এবং বর্তমান শতাব্দীর বিপ্লবী ইসলামী নেতাকে বিনা কারণে কারাপ্রাচীরের অভ্যন্তরে বন্দী রাখা শাসকদের পক্ষে আর সম্ভব হলোনা। ১৯৫০ এর ২৮শে মে মাওলানা মুক্তিলাভ করেন।

মুক্তিলাভ

গণ-পরিষদ আদর্শ প্রস্তাব পাশ করলো বটে, কিন্তু মাওলানার মুক্তিতে ইসলামী সমাজ ব্যবস্থার দুশমনগণ বিচলিত হয়ে পড়ে এবং 'আদর্শ প্রস্তাবে' অপব্যাখ্যা করতে থাকে। কিন্তু মাওলনার নেতৃত্বে জামায়াত কর্মীগণ বলিষ্ঠ যুক্তি সহকারে আদর্শ প্রস্তাবের মূল লক্ষ্য জনসাধারণের সামনে তুলে ধরেন।

আলেমগণের ২২-দফা

জামায়াতে ইসলমীর উদ্যোগে পাকিস্তানের একুশ জন প্রসিদ্ধ আলেম ১৯৫১ সালের ২১শে জানুয়ারী করাচীতে সমবেত হন এবং সর্বসম্মতিক্রমে ইসলামী শাসনতন্ত্রে ২২-দফা মূলনীতি প্রণয়ন করে সরকারের সামনে পেশ করেন। জামায়াতের পক্ষ থেকে এ ২২-দফা মূলনীতি বিপুল সংখ্যায় ছাপিয়ে সারাদেশে বিতরণ করা হয়। তারপরও শাসনতন্ত্র প্রণয়নের কাজে হাত দেয়া হচ্ছেনা দেখে জায়ায়াত ৯-দফা দাবী পেশ করে। ৯-দফার দাবীতে স্বাক্ষর অভিযানও জামায়াত কর্মীগণ শুরু করেন। এ অভিযান আন্দোলন ১৯৫২ সালের শেষ পর্যন্ত চলতে থাকে।

১৯৫৩

ইতিপূর্বে সরকারের পক্ষ থেকে একটি শাসনতন্ত্রের খসড়া তৈরী করা হয় কিন্তু তা না ছিল ইসলামী, আর না গণতান্ত্রিক। তাই জাতি তা প্রত্যাখ্যান করে। ১৯৫১ সালের ২৬শে নভেম্বর করাচীতে জামায়াতের উদ্যোগে ৯-দফার দাবীতে অনুষ্ঠিত জনসভায় মাওলানা বলিষ্ঠ কণ্ঠে ঘোষণা করেন যে, এবারে শাসনতন্ত্রের খসড়াটি পূর্বের মতো হলে তা ইসলামী জনতা প্রণেতাদের মুখের উপর ছুঁড়ে মারবে। ১৯৫২-র ডিসেম্বরে দ্বিতীয়বার খসড়া প্রণীত হলে তা পরীক্ষা করে দেখার জন্যে ১৯৫৩ সালের জানুয়ারীতে ৩১ জন আলেম একত্রে সমবেত হন। ১৮ই জানুয়ারী তাঁরা উক্ত খসড়া সম্পর্কে অতীব যুক্তিপূর্ণ প্রস্তাবাদি পেশ করেন।

এ মাসেই কাদিয়ানীদেরকে সংখ্যালুঘু ঘোষণা করার জন্যে করাচীতে এক সর্বদলীয় কনভেনশন আহূত হয়।

ডাইরেক্ট অ্যাকশন ঘোষণা

সাতাশে ফেব্রুয়ারী সর্বদলীয় কনভেনশনের কার্যকরী সংসদে কাদিয়ানী সম্প্রদায়কে সংখ্যালুঘু ঘোষণা করতে সরকারকে বাধ্য করার জন্যে ডাইরেক্ট অ্যাকশন বা প্রত্যক্ষ সংগ্রাম করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। জামায়াত প্রত্যক্ষ সংগ্রামের বিরোধিতা করে কনভেনশন থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করে। কনভেনশনের নেতাদেরকে পরের দিন গ্রেফতার করা হয়। পাঞ্জাবে প্রচন্ড গোলযোগ ও হাংগামা শুরু হয় সরকারী ভাষ্যে যাকে Punjab

Disturbance বলা হয়। অবশ্যি সরকার দাবী মেনে নিতে অস্বীকার করার ফলে এ অবাঞ্জিত হাংগামা শুরু হয়। ৪ঠা মার্চ থেকে ৬ই মার্চ পর্যন্ত এ হাংগামা চলে এবং ৬ই মার্চ লাহোরে সামরিক আইন জারী করা হয়। এ হাংগামায় সামরিক বাহিনীর গুলীতে ১১ জন নিহত ও ৪৯ জন আহত হয়। ৬ই মার্চ কয়েক ঘন্টার মধ্যে পরিস্থিতি সম্পূর্ণরূপে আয়ত্বে আসে।

৪ঠা ও ৫ই মার্চ মাওলানার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত কেন্দ্রীয় শূরার জরুরী অধিবেশনে প্রত্যক্ষ সংগ্রামের তীব্র নিন্দা করা হয়। এ সময়ে মাওলানা কাদিয়ানী সমস্যা নামে একখানি পুস্তিকা লেখেন। বইখানিতে তিনি মুসলমান ও কাদিয়ানীর মধ্যে মৌলিক পার্থক্য বিশ্লেষণ করে এ সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধান পেশ করেন।

মাওলানার প্রতি মৃত্যুদন্ডাদেশ

মাওলানা মওদূদীই তৎকালীন সরকারের একমাত্র চক্ষুশূল ছিলেন। তাই সরকার তাঁকে অনতিবিলম্বে ধরাপৃষ্ঠ থেকে সরিয়ে ফেলার বাহানা খুঁজছিলেন। এবার 'কাদিয়ানী সমস্যা' নামক নির্দোষ বইখানিকে বাহানা করে ২৮শে মার্চ মাওলানাকে গ্রেফতার করা হয় এবং ৮ই মে সামরিক আদালত তাঁর ফাঁসির আদেশ দেয়।

কিন্তু তাঁকে ফাঁসীকাষ্ঠে ঝুলানো সম্ভব হলো না। পাকিস্তানসহ গোটা মুসলিম বিশ্ব রুখে দাঁড়ালো। সরকার ভীত-সন্ত্রস্ত হযে মৃত্যুদন্ডকে যাবজ্জীবন কারাদন্ডে পরিবর্তিত করলেন। অতঃপর ১৯৫৫ সালের ২৯শে এপ্রিল মাওলানা বিনাশর্তে মুক্তিলাভ করেন।

পূর্বপাকিস্তান জামায়াতে ইসলামী ও মাওলানা মওদূদীর সফর

১৯৪৮ সালের মার্চ মাসে জনাব খুরশিদ আহমদ বাট নামক জনৈক সরকারী কর্মচারী পশ্চিম পাকিস্তান থেকে পূর্ব পাকিস্তানে বদলি হন। তাঁর ইচ্ছা ছিল যে, এখানেও ইসলামী আন্দোলনের তিনি সূচনা করেন। ঢাকায় আসার পর তিনি বরিশাল নিবাসী মাওলানা আবদুর রহীমকে ঢাকায়

আসার জন্যে পত্র দেন। মাওলানা আবদুর রহীম জবাবে জানান ঢাকায় থাকার জন্যে কোনো জায়গা ঠিক করে জানালে তিনি আসবেন।

ঢাকার নীলক্ষেতে একখানা কামরা ভাড়া করে মাওলানা আবদুর রহীমকে জানানো হয় এবং তিনি এপ্রিল মাসে ঢাকায় আসেন। ইতিমধ্যে কেন্দ্র থেকে জনৈক মাওলানা রফী আহমদ ইন্দোরীকে জামায়াতের কাজের জন্যে ঢাকা পাঠানো হয়। তিনি আসার পর নিম্নলিখিত চার ব্যক্তি কাজের সূচনা করেন ঃ

১. মাওলানা রফী আহমদ ইন্দোরী
২. জনাব খুরশিদ আহমদ বাট
৩. মাওলানা কারী জলিল আশরাফি নদ্‌ভী
৪. মাওলানা আবদুর রহীম।

উপরোক্ত চারজনের মধ্যে মাওলনা আবদুর রহীম ব্যতীত তিনজনই ছিলেন উর্দূভাষী এবং আন্দোলনের কাজে পাকাপোক্ত। সেজন্যে প্রথমে উর্দূভাষীদের মধ্যেই কাজের বিস্তার লাভ হতে থাকে। কারণ বাংলা ভাষায় তখন পর্যন্ত আন্দোলনের কোনো সাহিত্য তৈরী হয়নি।

অক্টোবরে মাওলনা মওদূদী দু'জন সহকর্মীসহ গ্রেফতার হন এবং সে খবর ঢাকায় পৌছে। তারপর মাওলানা আবদুর রহীম পিতার অসুস্থতার কারণে বরিশালে আপন বাড়ী চলে যান। বাংলাভাষীদের মধ্যে দাওয়াতী কাজ একরকম বন্ধ হয়ে যায়। ১৯৪৯ এর মাঝামাঝি মাওলানা আবদুর রহীম পুনরায় ঢাকায় আসেন। তখন নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ ঢাকায় কাজ করছিলেন ঃ

১. মাওলানা রফী আহমদ ইন্দোরী
২. জনাব খুরশিদ আহমদ বাট
৩. মাওলানা মন্‌যুর আহমদ জামেয়ী
৪. শেখ আমীনুদ্দীন [বিহার থেকে আগত মুহাজির]
৫. খাজা মাহবুব এলাহী
৬. সাইয়েদ হাফীজুর রহমান, রহমতুল্লাহ হাই স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা ও হেড মাষ্টার।

৭. মাওলানা কারী জলিল আশরাফ নদ্‌ভী।

মাওলানা মন্‌যুর আহমদ জামেয়ী ঢাকা জামায়াতে ইসলামীর আমীর নির্বাচিত হন।

মাওলানা আবদুর রহীম সাহেব ঢাকায় আসার পর তাঁকে সার্বক্ষণিক কর্মী নিযুক্ত করে আন্দোলনের উর্দু সাহিত্য বাংলায় তরজমা করার দায়িত্ব দেয়া হয়।

১৯৫১ সালের নভেম্বর মাসে করাচীতে অনুষ্ঠিত নিখিল পাকিস্তান জামায়াতে ইসলামী সম্মেলনে কেন্দ্রের নির্দেশে মাওলানা আবুদর রহীম যোগদান করেন এবং সম্মেলন শেষে কয়েক মাস তিনি কেন্দ্রে অবস্থান করেন। কেন্দ্রীয় জামায়াত সিদ্ধান্ত করে যে, পূর্ব পাকিস্তানে বাংলাভাষীকে কাজের দায়িত্ব অর্পণ করলে কাজের অগ্রগতি হতে পারে। তদনুযায়ী ১৯৫২ সালের ফেব্রুয়ারীতে মাওলানা আবদুর রহীম পূর্ব পাকিস্তানে ফিরে আসেন এবং জামায়াতে ইসলামী পাকিস্তানের পূর্ব পাকিস্তান শাখার কাইয়েম [সেক্রেটারী] নিযুক্ত হন এবং মাওলানা ইন্দোরী পূর্ব পাকিস্তান ত্যাগ করেন।

মন্‌যূর আহ্‌মদ জামেয়ী ঢাকা ত্যাগ করার পর অধ্যাপক ওযায়ের ঢাকা শহর জামায়াতের আমীর নির্বাচিত হন।

ইতিমধ্যে ২০৫, নবাবপুর রোডে জামায়াতের অফিস ভাড়া করা হয়। ১৯৫২ সালের মে মাসে বনগ্রাম রোডের এক বাড়ীতে জামায়াতের সম্মেলন হয় যেখানে বিভিন্ন স্থান থেকে কিছুসংখ্যক কর্মী যোগদান করেন। এ সম্মেলনে প্রখ্যাত ভাষাবিদ ও সাহিত্যিক ডাঃ শহীদুল্লাহ ও যোগদান করেন।

এ সময়ে ঢাকা কমিশনার অফিসে চাকুরীরত জনাব আবদুল খালেক [কুমিল্লা] জামায়াতে যোগদান করেন।

এ বছর পশ্চিম পাকিস্তান থেকে জামায়াতের একটি প্রতিনিধিদল পূর্ব পাকিস্তান আগমন করেন এবং এ দলের মধ্যে ছিলেন ঃ

১. মাওলানা আবদুল গাফ্‌ফার হাসান
২. মালিক নসরুল্লাহ খান আযীয

৩. চৌধুরী আলী আহমদ
৪. জনাব মুহাম্মদ বাকের খান
৫. জনাব আবদুল আযীয শর্কী
৬. সরদার আলী খান

তাঁরা পূর্ব পাকিস্তানের বিভিন্ন শহর সফর করেন। এ সময়ে যাঁরা জামায়াতের কাজ করছিলেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ঃ

চট্টগ্রামে–মাওলানা আমীন খান রেলভী ও মুহাম্মদ এবনে আলী উলুভী।

খুলনায়–মাওলানা আবুল কালাম মুহাম্মদ ইউসুফ, শিক্ষক।
বরিশালে–মাওলানা আবদুস্ সাত্তার, শিক্ষক।
কুষ্টিয়ায়–মাওলানা সাইয়েদ আলী।

প্রতিনিধিদলের সফর শেষে ঢাকার আর্মানীটোলা ময়দানে এক জনসভা অনুষ্ঠিত হয়–যার সভাপতিত্ব করেন মালিক নসরুল্লাহ খান আযীয। সভায় জামায়াতে ইসলামীর পরিচিতি ও দাওয়াত পেশ করা হয় এবং বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দেয়া হয়। মাওলানা মুফ্তী দীন মুহাম্মদ প্রথম থেকেই জামায়াতের আন্দোলনের কাজে উৎসাহ প্রদান ও সহযোগিতা করেন।

১৯৫৩ সালের জানুয়ারী মাসে চৌধুরী আলী আহমদ কেন্দ্রের নির্দেশে সামুদ্রিক জাহাজযোগে বিরাট লটবহরসহ চট্টগ্রাম হয়ে ঢাকায় পৌঁছেন। তিনি এপ্রিল মাস পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তানে অবস্থান করে বিভিন্ন স্থান সফর করেন এবং আন্দোলনের কাজ ব্যাপকতর করেন। এপ্রিলে তিনি পশ্চিম পাকিস্তান ফিরে যান।

এ সময়ে কাদিয়ানীদেরকে সংখ্যালঘু ঘোষণা করার আন্দোলণ, ডাইরেক্ট অ্যাকশন, মাওলানার মৃত্যু দন্ডাদেশ এবং পরবর্তীকালে যাবজ্জীবন কারাদন্ড প্রভৃতি ঘটনাগুলো ঘটতে থাকে যা উপরে বর্ণনা করা হয়েছে।

আগষ্ট মাসে পুনরায় চৌধুরী আলী আহমদ পূর্ব পাকিস্তানের আমীর হিসেবে আগমন করেন এবং সাংগঠনিক কাজ মজবুত করার দিকে মনোযোগ দেন। এ সময়ে জনাব আবদুল খালেককে চাকুরী থেকে ছাড়িয়ে সার্বক্ষণিক কর্মী করা হয় এবং আন্দোলনের কাজে গাইবাঁধা পাঠানো হয়।

১৯৫৪ সালে পূর্ব পাকিস্তানে প্রাদেশিক পরিষদের সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় এবং মুসলিম লীগকে পরাজিত করে যুক্তফ্রন্ট জয়ী হয়। দীর্ঘকালের মুসলিম লীগ শাসনের সমাপ্তি ঘটে। নির্বাচনের পর চৌধুরী আলী আহমদ পশ্চিম পাকিস্তান চলে যান।

এ বছর এক সর্বগ্রাসী প্লাবন অধিকাংশ জেলা প্লাবিত করে এবং জামায়াত কর্মীগণ ব্যাপক আকারে বন্যা দুর্গতদের মধ্যে ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ করতে থাকেন।

এ সময়ে রংপুর কারমাইকেল কলেজের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপক জনাব গোলাম আযম গাইবাঁধায় তাবলীগ জামায়াতের কাজে আগমনের পর জনাব আবদুল খালেকের নিকট থেকে আন্দোলনের দাওয়াত পেয়ে আন্দোলনের প্রতি আকৃষ্ট হন এবং জামায়াতে যোগদান করেন। তিনি রংপুরে ব্যাপকভাবে আন্দোলনের কাজ শুরু করেন।

১৯৫৪-র শেষে চৌধুরী আলী আহমদ সাইয়েদ আসাদ গিলানীসহ পূর্ব পাকিস্তানে ফিরে আসেন। রংপুরকে কেন্দ্র করে সাইয়েদ আসাদ গিলানীকে উত্তরাঞ্চলের জেলাসমূহের আমীর নিযুক্ত করে রংপুর পাঠানো হয়। তাঁর কাছে অধ্যাপক গোলাম আযম ইসলামী আন্দোলনের প্রেরণা ও প্রশিক্ষণ লাভ করেন। এভাবে রংপুরে কাজের বিস্তার লাভ ঘটতে থাকে। এসব ব্যাপারে রংপুরের জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের সাথে তাঁর কিছুটা বাকযুদ্ধ হওয়ার পর তিনি নিরাপত্তা আইনে গ্রেফতার হন।

এ সময়ে পূর্ব পাকিস্তানকে চারভাগে বিভক্ত করা হয় এবং এক একজনের উপর দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। যথা ঃ

১. চট্টগ্রাম বিভাগের দায়িত্ব দেয়া হয় শের আলী খানের উপর।

২. ঢাকা-ময়মনসিংহের দায়িত্ব অধ্যাপক ওয়ায়েরের উপর।

৩. দক্ষিণাঞ্চলের জেলাগুলোর দায়িত্ব মাওলানা আবদুর রহীমের উপর।

৪. উত্তরাঞ্চলের জেলাগুলোর দায়িত্ব সাইয়েদ আসাদ গিলানীর উপর।

মাওলানা আবদুর রহীমের উপর অতিরিক্ত দায়িত্ব দিয়ে খুলনা পাঠানো হয় এবং তিনি খুলনা থেকে জনাব শামসুর রহমান প্রকাশিত সাপ্তাহিক

তৌহিদের সম্পাদনার কাজও করতে থাকেন। প্রকাশকও জামায়াত কর্মী ছিলেন।

পঞ্চান্নর এপ্রিলে মাওলানা মওদূদী জেল থেকে মুক্তি লাভের পর ব্যাপক সফর শুরু করেন। সর্বত্র বিপুল সংখ্যক ইসলামী জনতা মাওলানার মতো একজন যিন্দাহ্ শহীদ মর্দে মুজাহীদকে আন্তরিক সম্বর্ধনা জানায়। নভেম্বরে করাচীতে জামায়াতে ইসলামীর নিখিল পাকিস্তান সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। পূর্ব পাকিস্তানের আমীর চৌধুরী আলী আহমদ এবং তাঁর সাথে বহু সংখ্যক কর্মী এ সম্মেলনে যোগদান করেন। চৌধুরী সাহেব বলেন, যেহেতু এখন জামায়াতের কাজ পরিচালনার জন্যে বাংলাভাষী যোগ্যলোক তৈরী হয়েছে, আমাকে পূর্ব পাকিস্তানের আমীরের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেয়া হোক। তাঁর এ প্রস্তাব গৃহীত হয় এবং নির্বাচন সাপেক্ষে মাওলানা আবদুর রহীমের উপর আমীরের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়।

এটাও সিদ্ধান্ত হয় যে, আবদুল খালেককে চট্টগ্রাম বিভাগের দায়িত্ব দিয়ে চট্টগ্রাম পাঠানো হোক এবং সাইয়েদ আসাদ গিলানীর স্থলে উত্তর বংগের জেলাগুলোর দায়িত্ব অধ্যাপক গোলাম আযমের উপর অর্পিত হোক। তদনুযায়ী অধ্যাপক গোলাম আযম ও জনাব আবদুল খালেক স্ব স্ব দায়িত্ব বহন করেন।

এ সময় জাতীয় পরিষদে শাসনতন্ত্র প্রণয়ণের কাজ চলছিল। সদস্যগণকে ইসলামী শাসনতন্ত্রের স্বপক্ষে প্রভাবিত করার উদ্দেশ্যে অধ্যাপক গোলাম আযমকে দায়িত্ব দেয়া হয় এবং তিনি করাচী গমন করেন। মাওলানার প্রণীত Islamic Law and Constitution গ্রন্থখানি গোলাম আযম সাহেব সদস্যগণের মধ্যে বিতরণ করে 'লবি' করতে থাকেন। ১৯৫৬ সালের ২৪শে জানুয়ারী মওদূদী (র) পূর্ব পাকিস্তান সফরের উদ্দেশ্যে ঢাকা পৌঁছেন। মাওলানা তখন আবদুর রহীম পূর্ব পাকিস্তানের আমীর এবং অধ্যাপক গোলাম আযম কাইয়েম ছিলেন।

এ সময় পাকিস্তানের রাষ্ট্র ব্যবস্থায় চরম ভাংগা-গড়ার খেলা চলছিল। গভর্ণর জেনারেল গোলাম মুহাম্মদ কর্তৃক গণ-পরিষদ ভেঙ্গে দেবার পর সামরিক-বেসামরিক লোকের সমন্বয়ে গঠিত হয় ট্যালেন্ডে [প্রতিভাবান]

মন্ত্রীসভা। শহীদ সোহরাওয়ার্দী তার আইন মন্ত্রী। ফেডারেল কোর্টের রায় অনুযায়ী ট্যালেন্টেড মন্ত্রী সভা ১৯৫৫ সালের মে মাসে জাতীয় পরিষদের নির্বাচন করতে বাধ্য হয়। চোধুরী মুহাম্মদ আলী প্রধান মন্ত্রী হন। তিনি ইসলামী শাসনতন্ত্র প্রণয়নের চেষ্টা করতে থাকেন। সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ হিন্দু সদস্যদের সাথে মিলে ইসলামী শাসনতন্ত্র প্রণয়নের পথে প্রবল প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। সারাদেশে ইসলামী শাসনতন্ত্রের পক্ষে সংগ্রামের এক প্রবল ঝড় চলতে থাকে।

এ সময় মাওলানা পূর্ব পাকিস্তান সফরে আসেন। তিনি প্রতিটি জেলা শহরে এবং কিছু মহকুমা শহরে লক্ষ লক্ষ জনতার সামনে বক্তৃতা করেন। ইসলামের দাওয়াত পেশ করেন, ইসলামী শাসনতন্ত্রের আবশ্যকতা বুঝিয়ে দেন, শত শত প্রশ্নের জবাব দেন এবং শত শত লোককে ব্যক্তিগত সাক্ষাৎ দান করেন।

সফর শেষে ৪ঠা মার্চ ঢাকা জেলা বোর্ড হলে এক সুধী সমাবেশে বক্তৃতা প্রসঙ্গে প্রধানঃ পূর্ব পাকিস্তানের যাবতীয় সমস্যা ও অভাব-অভিযোগ ও তার সুষ্ঠ সমাধান সম্পর্কে দীর্ঘ আলোচনা করেন। বহিরাগতদের দ্বারা সৃষ্ট সমস্যা, ভাষা সমস্যা, সরকারী চাকুরী সমস্যা, দেশ রক্ষা সমস্যা প্রভৃতি গভীরভাবে উপলব্ধি করে সে সবের উপর সুস্পষ্ট বক্তব্য ও সমাধান পেশ করেন। জীবনের প্রথমবার মাত্র ছ'মাসের জন্যে পূর্ব পাকিস্তান সফর করে তিনি এখানকার প্রকৃত সমস্যাবলীর গভীরে প্রবেশ করেন এবং সুষ্ঠ সমাধানের কথা বলে দেন।

মাওলানার দ্বিতীয়বার পূর্ব পাকিস্তান সফর

১৯৫৬ সালের ২৩শে মার্চ জাতীয় পরিষদ ইসলামী শাসনতন্ত্র পাশ করে। কিন্তু নির্বাচন প্রথার মতো একটা অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় অমীমাংসিত রয়ে যায়। দেশে যুক্ত নির্বাচন, না পৃথক নিবৃাচন প্রবর্তন করা হবে এ প্রশ্নের মীমাংসার জন্য ১৯৫৮ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে ঢাকায় জাতীয় পরিষদের বৈঠক ডাকা হয়। ইসলামী শাসনতন্ত্র বিরোধী আওয়ামী লীগ নেতা হুসাইন শহীদ সোহরাওয়ার্দী পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী। পৃথক নির্বাচনের দাবীতে সারাদেশে প্রবল আন্দোলন চলছিল। ইতিপূর্বে পশ্চিম পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদ পৃথক নির্বাচনের পক্ষে এবং আওয়ামী লীগ

মন্ত্রী সভার অধীন পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদ যুক্ত নির্বাচনের পক্ষে রায় দিয়েছে। এখন জাতীয় পরিষদে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হবে।

এমন এক রাজনৈতিক অশান্ত পরিবেশে ১৯৫৬ সালের ফেব্রুয়ারীতে মাওলানা পূর্ব পাকিস্তান সফরে আসেন। তিনি বিভিন্ন জেলা ও মহকুমা শহর সফর করেন, পৃথক নির্বাচনের সপক্ষে বলিষ্ঠ যুক্তি পেশ করেন। তার সপক্ষে এক বলিষ্ঠ জনমত সৃষ্টি হয়। কিন্তু কেন্দ্রীয় আওয়ামী লীগ মন্ত্রীসভা শেষ রাতের এক নিদ্রাচ্ছন্ন পরিবেশে জাতীয় পরিষদে যুক্ত নির্বাচন পাশ করে জাতির উপর এক অভিশাপ চাপিয়ে দেয়।

পরের বছর, ১৯৫৯ সালে সারাদেশে সাধারণ নির্বাচন হবে ঘোষণা দেয়া হয়েছে এবং তার প্রস্তুতি চলছে। এমন সময় ৮ই অক্টোবর সারা দেশের উপর আইয়ুব খান সামরিক আইন জারী করেন। জাতীয় পরিষদ ভেঙ্গে দেয়া হয়। শাসনতন্ত্র বাতিল করা হয়, সকল রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। এতো দিনের ভেতর-বাইরের ইসলাম বিরোধী চক্রগুলোর ষড়যন্ত্রের এটাই ছিল ফল। জামায়াতে ইসলামীর কর্মীগণ সর্বত্র ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক ময়দানে তাদের কর্মতৎপরতা অব্যাহত রাখেন। ১৯৬২ সালের ১৫ই জুলাই পর্যন্ত দেশে এ অবস্থা বিরাজ করে। ১৯৫৯ সালে কুরআনে বর্ণিত ঐতিহাসিক স্থানগুলো দেখার জন্যে মাওলানা মধ্যপ্রাচ্য ভ্রমন করেন। তাঁর বিপ্লব সৃষ্টিকারী তাফহীমূল কুরআনে এসব স্থানগুলোর নকশা ও বিবরণ দেয়া হয়েছে। ১৯৬১ সালের মে মাসে মক্কায় অনুষ্ঠিত বিশ্ব ইসলামী সম্মেলনে মাওলানা যোগদান করেন এবং রাবেতায়ে আলমে ইসলামীর প্রতিষ্ঠা সদস্য নির্বাচিত হন।

১৯৬২ সালে দেশে আইয়ুব খান প্রবর্তিত মৌলিক গণতন্ত্রের ভিত্তিতে জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন হয়। তাতে পূর্ব পাকিস্তান থেকে তিনজন জামায়াত সদস্য জাতীয় পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। পূর্ব পাকিস্তান পরিষদে দু'জন এবং পশ্চিম পাকিস্তান পরিষদে তিনজন জামায়াত সদস্য নির্বাচনে জয়ী হন। পরিষদে জামায়াত সদস্যগণ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন।

১৯৬২ সালের ১৫ই জুলাই থেকে সামরিক শাসন প্রত্যাহার করা হয় এবং জামায়াত আগের মতো তার কর্মতৎপরতার শুরু করে।

নিখিল পাকিস্তান জামায়াতে ইসলামী সম্মেলন [১৯৪৯-৬৩]

১৯৪৯ সাল থেকে ৬৩ সাল পর্যন্ত নিখিল পাকিস্তান জামায়াতে ইসলামী সম্মেলন মাত্র পাঁচটি হয়েছে–

১৯৪৯ – মে মাসে লাহোরে।

১৯৫১ – নভেম্বরে করাচীতে।

১৯৫৫ – নভেম্বরে করাচীতে।

১৯৫৭ – ফেব্রুয়ারীতে মাছিগোট রহীমইয়ার খানে।

১৯৬৩ – অক্টোবরে লাহোরে।

এ কথা দিবালোকের মতো সত্য যে, পাকিস্তানের কোনো সরকারই জামায়াত ইসলামীকে বরদাশ্‌ত করতে পারেনি। আর এ আন্দোলনের প্রাণশক্তি ছিলেন মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী। সকল ইসলাম বিরোধী ও সিকিউল্লার শক্তির একমাত্র টারগেট ছিলেন মাওলানা মওদূদী। তাই বার বার তাঁকে কারা অভ্যন্তরে বন্দী করে রাখা হয়েছে। মৃত্যুদন্ড দিয়ে রাতারাতি তাঁর জীবনলীলা শেষ করার চেষ্টা করা হয়েছে। তারপর তাঁকে জেলের বাইরেও মুক্ত আবহাওয়ায় ভাড়াটিয়া গুন্ডা দিয়ে হত্যার চেষ্টাও করা হয়েছে। ১৯৬৩ সালে লাহোরে অনুষ্ঠিত জামায়াত সম্মেলনে তাঁকে লক্ষ্য করে পিস্তলের গুলী করা হয়। এমনি আরও কয়েকবার এ ধরনের চেষ্টা করা হয়। কিন্তু বাতিল পন্থীদের সকল চেষ্টা ব্যর্থ হয়।

১৯৬৪ সালের ৬ই জানুয়ারী আইয়ুব সরকার জামায়াতে ইসলামীকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। মাওলানাসহ কেন্দ্রীয় পর্যায়ের ষাটজন নেতাকে গ্রেফতার করে জেলে পাঠানো হয়। তার বিরুদ্ধে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান হাইকোর্টগুলোতে মামলা দায়ের করা হয়। পূর্ব পাক হাইকোর্ট পক্ষে এবং পশ্চিম পাক হাইকোর্ট বিপক্ষে রায় দেয়। পরে ২৫শে সেপ্টেম্বর, পাকিস্তান সুপ্রীম কোর্ট জামায়াতকে নিষিদ্ধকরণ ও নেতাদের গ্রেফতারীকে অন্যায়, বেআইনী ও বাড়াবাড়ি বলে রায় দান করে।

১৯৬৫ সালের ৬ই সেপ্টেম্বর ভারত পাকিস্তানের উপর স্থল ও আকাশ পথে হামলা চালায়। দেশের স্বাধীনতা বিপন্ন হয়। এমন সময় মাওলানার প্রতি চিরদিন বিরূপ মনোভাবাপন্ন আইয়ুব খান তাঁর কাছে যুদ্ধে সক্রিয় সহযোগিতা কামনা করেন। মাওলানা জিহাদের উপর ক্রমাগত ছ'দিন রেডিও পাকিস্তান থেকে উদ্দীপনাময় ভাষণ দান করেন–জামায়াত কর্মীগণকে দেশ রক্ষার খেদমতে মাঠে নামিয়ে দেন। জামায়াতে ইসলামীর এ সময়ের নিঃস্বার্থ জাতীয় খেদমত সেনাবাহিনী ও জনগণের মন জয় করে। যুদ্ধে পাকিস্তান জয়ী হয়।

এ যাবত মাওলানা আবদুর রহীম জামায়াতে ইসলামী পূর্ব পাকিস্তান-এর আমীর পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি ইসলামী রিসার্চ একাডেমী পূর্ব পাকিস্তান শাখার প্রধানও ছিলেন। পূর্ব পাকিস্তানের আমীরের পদ থেকে তাঁকে জামায়াতে ইসলামী পাকিস্তান-এর নায়েবে আমীরের পদে নিয়োগ করা হয়। ফলে পূর্ব পাকিস্তানে জামায়াতের আমীরের পদ শূণ্য হয়। এ পদের জন্যে ১৯৭০ সালে যে নির্বাচন হয় তাতে অধ্যাপক গোলাম আযম আমীর নির্বাচিত হন।

একাত্তরের ভূমিকা

তারপর পাকিস্তানের রাজনীতির অংগনে কতকগুলো দুঃখজনক ঘটনা ঘটতে থাকে। আইয়ুব খানের দশ বছরের স্বৈরাচারী শাসন দেশের রাজনীতিকে কলুষিত করে, গণতন্ত্রকে হত্যা করে। রাজনীতিকদের একটা স্বার্থান্বেষী সুবিধাবাদী গোষ্ঠীর সৃষ্টি হয়, অবিচার অনাচার চলতে থাকে। জামায়াতে ইসলামী ১৯৬৮ পর্যন্ত দেশে গণতান্ত্রিক ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশ ফিরে আনার আপ্রাণ চেষ্টা করে। অন্যান্য দলের সাথে মিলেও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে অংশগ্রহণ করে। পরে গণ-অসন্তোষ ও গণ-বিক্ষোভ এমন আকার ধারণ করে যে, আইয়ুব খান ইয়াহিয়া খানের হাতে ক্ষমতা দিয়ে সরে পড়তে বাধ্য হন। তারপর কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে এবং পরে পশ্চিম পাকিস্তানীদের বিরুদ্ধে পূর্ব পাকিস্তানে এক গণ-আন্দোলন শুরু হয়। এ আন্দোলন এমন ঝড়ের বেগে চলতে থাকে যে একাত্তরের মাঝামাঝি তা শেষ পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তানকে মূল পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন করে স্বাধীন

দেশ হিসেবে দাঁড় করাবার দূর্বার প্রেরণা সৃষ্টি করে। আন্দোলনের নেতৃত্ব চলে যায় আওয়ামী লীগের হাতে। স্বাধীনতার সংগ্রামের সাথে সাথে স্বাধীনতা উত্তরাকালীন রাষ্ট্র ব্যবস্থার মূলনীতি হিসেবে সমাজতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষবাদ, বাংগালী জাতীয়তাবাদ ও গণতন্ত্রকে তারা বার বার ঘোষণা করতে থাকেন।

দেশের সত্যিকার স্বাধীনতার প্রশ্নে কারো কোনো দ্বিমত থাকতে পারেনা। কিন্তু স্বাধীনতার সাথে যে রাষ্ট্রীয় মূলনীতির কথা বলা হচ্ছিল, তা একজন মুসলমানের জন্যে কিছুতেই গ্রহণ যোগ্য হতে পারে না। সমাজতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষবাদ ও ভৌগলিক ভাষাভিত্তিক সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদ সব কিছুই ইসলামী আকীদাহ-বিশ্বাস ও চিন্তাধারার একেবারে পরিপন্থী। জামায়াতে ইসলামী আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে শপথদীপ্ত এক আন্দোলন। তা কি করে ইসলাম বিরোধী ধারণা মতবাদ গ্রহণ করতে পারে? তাই জামায়াতে ইসলামীর বিরোধিতা স্বাধীনতার বিরুদ্ধে নয় ইসলাম বিরোধী মতবাদ ও জীবন-বিধান প্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধে। তাছাড়া জায়ায়াতে ইসলামী তার অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে স্পষ্টই দেখতে পেয়েছিল যে, যে পদ্ধতিতে এবং যেসব শ্লোগানের মাধ্যমে আন্দোলন এগিয়ে চলেছিল এবং যেসব শক্তি পশ্চাৎ থেকে মদদ ও প্রেরণা যোগাচ্ছিল, তাতে করে দেশ বাহ্যতঃ স্বাধীন হলেও অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক দিক দিয়ে বহিঃশক্তির গোলাম হয়ে পড়বে, মুসলমানদের ইসলামী সংস্কৃতির মূলোৎপাটন করে তথায় পৌত্তলিক চিন্তাধারা ও সংস্কৃতি চাপিয়ে দেয়া হবে। স্বাধীন বাংলাদেশের জন্মের পর থেকে ১৯৭৫-এর ১৫ই আগষ্ট পর্যন্ত আমাদের আশংকার বাস্তব রূপই আমরা দেখতে পেয়েছি।

সমাজতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষবাদ তথা ধর্মহীনতা এবং সংকীর্ণ ভৌগোলিক ও ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবাদ প্রতিষ্ঠার নামে যে স্বাধীনতা আন্দোলন চলছিল তা সমর্থন না করাই ছিল একজন সত্যিকার মুসলমানের ঈমানের দাবী। যে ইসলামী জীবন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার নামে পাকিস্তানের জন্ম হয়েছিল, বিগত দু'যুগেও তা যখন করা হয়নি, তখন সে ইসলামী জীবন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে যদি স্বাধীনতা আন্দোলন করা হতো, তাহলে জামায়াতে

ইসলামী তার সর্বাগ্রে থাকতো। কিন্তু ঘটনার পট পরিবর্তন এমন ঝড়ের বেগে হচ্ছিল যে, ঐ ধরনের কোনো আন্দোলনের না সুযোগ ছিল, আর না কোনো পরিবেশ।

ইসলামের এ মৌলিক আদর্শের উপর অবিচল থাকার জন্যে শত শত জামায়াত কর্মী পৈশাচিক অত্যাচার নির্যাতনের শিকার হয়েছে। শত শত কর্মীর তাজা খুনে ধরনী রঞ্জিত হয়েছে। শত শত কর্মীর বাড়ী-ঘর, দোকান-পাট ধ্বংস করা হয়েছে। লক্ষ লক্ষ টাকার সম্পদ লুঠ করা হয়েছে। অনেকে অন্যদেশে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছে।

তথাপি একাত্তরের ১৬ই ডিসেম্বর যে স্বাধীন বাংলাদেশের জন্ম হয়েছিল, তার শাসন ব্যবস্থার মূলনীতি মেনে না নিতে পারলেও দেশের স্বাধীন সত্তাকে জামায়াত কর্মীগণ তখনই মেনে নিয়েছে। শাসন ব্যবস্থার মূলনীতি ও শাসন পদ্ধতি সদা পরিবর্তনশীল। জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ এ দেশে ইসলামী সমাজ ব্যবস্থার সংগ্রাম করছে এবং করতে থাকবে। দেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব সংরক্ষণের জন্যেও জামায়াত দৃঢ়-সংকল্প। কারণ, দেশের স্বাধীনতা অক্ষুন্ন না থাকলে, জামায়াতে ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার সুযোগই বা কেমন করে পাবে? স্বাধীনতা বিনষ্ট হলে দীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামও অর্থহীন হবে। তাই স্বাধীনতার সংরক্ষণের জন্যে প্রতিটি জামায়াত কর্মী তাদের শেষ রক্তবিন্দু দিতে সদা প্রস্তুত থাকবে।

১৯৭২ সালে স্বাধীন বাংলাদেশের যে সংবিধান রচিত হয় তার অধীনে মুসলমানী জীবন-যাপন সম্ভব ছিল না। এ সম্পর্কে বিভিন্ন বিদেশী সংবাদ সংস্থাও মন্তব্য করে। ইসলামের নামে দল গঠন ও ইসলামী আন্দোলন ও তৎপরতা নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। গণতন্ত্রকে হত্যা করে এক দলীয় শাসন কায়েম হয় যার প্রতিক্রিয়া স্বরূপ ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগষ্ট এক সাধারণ বিপ্লব হয় এবং অবস্থার আমূল পরিবর্তন সূচিত হয়। ইসলামের জাতীয় শ্লোগান 'আল্লাহু আকবর' এর স্থানে এ যাবত 'জয়বাংলা' জাতীয় শ্লোগান হয়ে পড়েছিল। বিপ্লবের পর মুসলমানগণ তাদের ঈমান আকীদাহর সাথে সম্পর্কিত 'আল্লাহু আকবর' শ্লোগান আবার ফিরে পায় এবং তাদের হৃদয়ে আশার সঞ্চার হয়।

আগষ্ট বিপ্লব খোন্দকার মুশতাক আহমদকে প্রেসিডেন্ট পদে অধিষ্ঠিত করে। নভেম্বরে বিদেশী সাহায্য সহযোগিতায় এক প্রীত বিপ্লব ঘটে। কিন্তু দেশের সিপাহী জনতার সম্মিলিত শক্তি সে প্রতি বিপ্লবকে নস্যাৎ করে দেয় যার ফলে বিচারপতি সায়েম দেশের প্রেসিডেন্ট এবং মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান সেনাবাহিনী প্রধান হন। কিছুকাল পর জিয়াউর রহমান সকল ক্ষমতা হস্তগত করেন। দেশে সামরিক আইন চলতে থাকে। পলিটিক্যাল পার্টিজ রেগুলুশেন-এর আওতায় রাজনৈতিক দল গঠনের অনুমতি দেয়া হয় ১৯৭৬ সালে।

বাংলাদেশে জামায়াত কর্মীগণ রীতিমত সংগঠনের মাধ্যমে প্রকাশ্যে ইসলামী আন্দোলন না করলেও আন্দোলন থেকে দূরে সরে পড়েনি। বিভিন্ন সাংস্কৃতিক ও দীনি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তাঁরা নিজেদের মধ্যে আন্দোলনের প্রেরণা জাগ্রত রাখেন। কয়েকটি অধুনালুপ্ত দলের সমন্বয়ে মাওলানা সিদ্দীক আহমদের নেতৃত্বে ১৯৭৬ সালে আইডি এল [ইসলামিক ডিমোক্রেটিক লীগ] নামে P. P. R [Political Parties Regulation] এর আওতায় এক নতুন দল গঠিত হয়। জামায়াত কর্মীগণ এ দলে যোগদান করে। পরবর্তী বৎসর মাওলানা আবদুর রহীম [সাবেক পূর্ব পাকিস্তানের আমীর] আই ডি, এল,-এর সভাপতি হয়। ১৯৭৯ সালে জাতীয় নির্বাচনের পূর্বে P. P. R রহিত করা হয় এবং নির্বাচনের পর ২৫শে মে, ১৯৭৯ একটি কনভেনশনের মাধ্যমে এ কথা ঘোষণা করা হয় যে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ এখন থেকে প্রকাশ্য ময়দানে কাজ করতে থাকবে এবং তখন থেকে করে আসছে।

◆ ◆ ◆

জামায়াতে ইসলামীর বৈশিষ্ট্য

জামায়াতে ইসলামীর আন্দোলন, এর সংগঠন, কর্মসূচী ও কর্মপদ্ধতি, জামায়াত প্রতিষ্ঠাতার তৈরী বিরাট সাহিত্য ভান্ডার, ইসলামী মন মস্তিষ্ক ও চরিত্র তৈরীর জন্যে স্থায়ী প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা, জামায়াতের বাস্তব ভূমিকা প্রভৃতি থেকে তার যে বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠে সে সম্পর্কে কিছু কথা পাঠক সমাজের কাছে পেশ করতে চাই।

১. এ জামায়াতের দাওয়াত, আকীদাহ-বিশ্বাস ও লক্ষ্যের দিকে। কোনো ব্যক্তিত্বের দিকে নয়।

২. এ জামায়াতের গঠন প্রকৃতি কোনো সংকীর্ণ ফের্কার মত নয়। জামায়াতের পক্ষ থেকে সুস্পষ্ট ঘোষণা যে, আমাদের পক্ষ থেকে এ দাবী কখনো করা হবে না যে ইসলাম শুধু এ জামায়াতের পরিসীমার মধ্যেই রয়েছে।

৩. গুরুত্বপূর্ণ কথা এই যে জামায়াতে অংশ গ্রহণকারীকে এ কথা বলে দেয়া হয়-জামায়াতের দাওয়াত, কর্মসূচীও লক্ষ্য পূর্ণ অনুভূতি সহকারে বুঝে নিয়ে জামায়াতে যোগদান করুন। বিভিন্ন প্রকারের ধ্যান-ধারণা, স্বার্থ ও ইচ্ছা-বাসনা পরিত্যাগ করে একমাত্র 'ইকামতে দীনের' মহান কাজে একনিষ্ঠ হয়ে যান।

৪. প্রত্যেকের বুনিয়াদী কাজ এই যে, সে তার দীনি ইল্‌ম বাড়াতে থাকবে এবং নিজের ইসলাহ্ করার সাথে সাথে হকের দাওয়াত ভালোভাবে এবং হৃদয়গ্রাহী করে অন্যের কাছে পৌছাবে। এ সম্পর্কিত সাহিত্য লোকের মধ্যে বিতরণ করবে।

এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, জামায়াতের প্রাথমিক কর্মীগণ এ ব্যাপারে প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন করেছেন। তাঁরা আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশী, পরিচিত-অপরিচিত লোক, অফিস-আদালত ও কল-কারখানা, সংগী-সাথীদের দ্বারে দ্বারে গিয়েছেন এবং নিষ্ঠার সাথে ইসলামী দাওয়াত

পেশ করেছেন। সাথে বই-পুস্তক নিয়ে বস্তি বস্তি ঘুরেছেন। কোথাও বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হয়েছে, কোথাও মাওলানা প্রতি গালি বর্ষিত হয়েছে। কেউ কথা শুনেছে, কেউ শুনতেই চায়নি। তাঁদের এ নিঃস্বার্থ শ্রমের জন্যে আজ দাওয়াতের ক্ষেত্র প্রশস্ততর হয়েছে। বিপ্লবী কাজের এইত কর্মপদ্ধতি যার কোনো বিকল্প নেই। এ কাজ ত সকল সময় সকল অবস্থাতেই করা যায়। শুধু প্রয়োজন দৃঢ় সংকল্প ও সৎ সাহসের। জামায়াত কর্মীদের এইত উন্মাদনাসুলভ কাজ যার অভাব ঘটলে আর কর্মী থাকা যায় না। শুধু তাই নয় ঈমান ও আখলাকের দিক দিয়েও অধঃপতন হয়। যারা একাজ অব্যাহত গতিতে করে চলেছেন তাঁরাই হচ্ছেন এ আন্দোলনের মূল্যবান মূলধন।

৫. জামায়াতের সংগঠনিক কাঠামো এভাবে তৈরী করা হয়েছে যে, দায়িত্বশীলগণ সর্বদা অন্যান্যদের সাথে পরামর্শ করে কাজ করবেন। কেউ স্বয়ং কোনো পদপ্রার্থী হওয়ার চেষ্টা করতে পারবেনা। এখানে নির্বাচনে কেউ পদপ্রার্থী হতে পারেনা।

৬. সংগঠনিক পরিমন্ডলের ভেতরে একে অপরের বিরুদ্ধে গোপন পরামর্শ ক্যানভাসিং অথবা উপদল গঠন একেবারে নিষিদ্ধ।

৭. সংগঠনিক কাঠামোর বিভিন্ন স্তর আছে। তার সর্বনিম্ন বুনিয়াদী স্তর বা ইউনিট–স্থানীয় জামায়াত। এখানে সাপ্তাহিক বৈঠক হয়, কুরআন হাদীসের আলোচনা হয়, কাজের রিপোর্ট পেশ করা হয়, ভবিষ্যতের কর্মসূচী তৈরী হয়। কেন্দ্র থেকে প্রেরিত সার্কুলার বা হেদায়েত বৈঠকে আলোচনা করা হয়। স্থানীয় কাজ-কর্মের সুবিধা-অসুবিধা প্রভৃতিও আলোচনা করা হয়।

৮. জামায়াতের একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, তার দাওয়াত সংগঠন, সভা-সমিতি এবং বিভিন্ন তৎপরতার জন্যে যে অর্থ ব্যয় হয় তা সংগঠনের ভেতর থেকেই সংগ্রহ করা হয়, বাইরের কোনো শুভাকাংখী কিছু দিলে তা গ্রহণ করা হয়। অথবা কোনো সমাজ সেবামূলক কাজে. যেমন আর্ত-দুর্গতদের ত্রাণ কাজে, কোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগে বিপন্ন লোকদের সাহায্যার্থে অর্থ বা ত্রাণ সামগ্রীর প্রয়োজন হলে তার জন্যে অপরের কাছে আবেদন জানানো যেতে পারে। তাতে তার জন্যে পাকা রশিদ দিয়ে অর্থ গ্রহণ করা হয় এবং যাবতীয় আয় ব্যয়ের হিসাব প্রকাশ করে দেয়া হয়।

জামায়াতের যাবতীয় খরচপত্রাদির দায়িত্ব জামায়াত কর্মীদের উপরই অর্পণ করা হয় এবং ফলে তাদের মধ্যে আল্লাহর পথে অকাতরে অর্থ বিলিয়ে দেয়ার প্রেরণা সৃষ্টি হয়। তাছাড়া প্রতিটি কর্মী নিষ্ঠার সাথে প্রতিটি কপর্দক ব্যয় করেন। যার ফলে যে কাজ অন্যের দ্বারা করতে যে অর্থ ব্যয় হয়, তার অনেক কম অর্থে অতি সুন্দরভাবে জামায়াত কর্মীগণ সুসম্পন্ন করেন।

৯. সংগঠনের একটা স্থায়ী প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা আছে। পরিপূর্ণ কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে এ ব্যবস্থা চালানো হয়। কুরআন হাদীস এবং ইসলামী সাহিত্য অধ্যয়নের মাধ্যমে, প্রশিক্ষণ শিবিরের মাধ্যমে, দাওয়াত ছড়াবার মাধ্যমে এবং প্রত্যক্ষ বাতিল শক্তির অত্যাচার উৎপীড়নের মাধ্যমে উন্নতমানের মানসিক ও চারিত্রিক প্রশিক্ষণ লাভের এক অকৃত্রিম ও স্বাভাবিক ব্যবস্থা রয়েছে জামায়াতে।

১০. সময়ানুবর্তিতা জামায়াতের একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য। ঠিক পূর্ব ঘোষিত সময় সভা সম্মেলন ও বৈঠকাদির কাজ শুরু করা এবং অন্যান্য সকল প্রকার জরুরী বৈষয়িক কাজ কর্ম ফেলে সংগঠনের ডাকে যথা সময় হাজির হওয়া জামায়াতের অসাধারণ শৃংখলাবোধের পরিচায়ক।

১১. জামায়াতের নিজস্ব একটা ভাষণদান পদ্ধতি রয়েছে। ভাষণের মধ্যে সূর করে কোনো কবিতা, গজল, আবৃত্তি, হাস্যরসাত্মক কোনো কথা, অশালীন অথবা অবান্তর ভিত্তিহীন কোনো উক্তি জামায়াতের মঞ্চ থেকে বলা হয়না। বক্তা তাঁর বক্তব্য পূর্ব থেকে তৈরী করে যান এবং নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই তাঁর তথ্যপূর্ণ ভাষণ দান করেন, ভাষণকে যথাসাধ্য হৃদয়গ্রাহী করার চেষ্টা করেন এবং শ্রোতার দৃষ্টি ও মনোযোগ আকৃষ্ট করেন। ভাষণের মধ্যে শব্দের বাগাড়ম্বর থাকেনা, হাস্যরসের খোরাক থাকেনা, থাকে চিন্তার খোরাক। তাই জামায়াতের বক্তৃতার ধরন সমাজে চিরাচরিত বক্তা ওয়ায়েজীন থেকে ভিন্ন ধরনের এবং শিক্ষিত চিন্তাশীলদের কাছে এ পদ্ধতি খুবই আকর্ষণীয়।

১২. জামায়াতের ইকামতে দীনের দাওয়াতে প্রভাবিত হয়ে যাঁরা আন্দোলনে যোগদান করেছেন তাঁদের জীবনে এক বিপ্লব সৃষ্টি হয়েছে।

অবৈধ রুজি রোজগার বন্ধ করে দিয়েছেন। তার জন্যে অনেকে ব্যবসা ও চাকুরী ছাড়তে বাধ্য হয়েছেন। অবৈধ জীবিকা পরিত্যাগ করার পর সহাস্যে দারিদ্র বরণ করেছেন। শরীয়ত বিরোধী সকল অভ্যাস পরিত্যাগ করেছেন। এ সম্পর্কে স্বয়ং মাওলানা মওদূদী বলেন ঃ

"আমরা যা কিছু সুফল লাভ করেছি তার মধ্যে বড়ো সুফল এই যে, আমাদের এ দাওয়াতের প্রভাব যেখানেই পৌঁছেছে, সেখানেই তা মৃত বিবেককে জীবিত করেছে এবং ঘুমন্তকে জাগ্রত করেছে। তার প্রথম প্রতিক্রিয়া এই যে, নফ্স্ তার আত্মসমালোচনা শুরু করেছে। পূর্বে সংকীর্ণ ধর্মীয় ধ্যান ধারণার ভিত্তিতে হালাল হারাম, পাক নাপাক ও হক নাহকের যে পার্থক্যবোধ ছিলো, তা জীবনের সকল ক্ষেত্রে সকল বিষয়ে অনেক পরিমাণে ব্যাপকতর হয়েছে। পূর্বে যে দীনি অনুভূতি এতোটা প্রাণহীন ছিলো যে, অনেক চাঞ্চল্যকর বিষয়ও মনে কোনো সাড়া জাগাতোনা, এখন তা এতোটা তীব্র হয়ে পড়েছে যে, ছোটোখাটো বিষয়ও মনে আঘাত করে। .... চিন্তার বিচ্ছিন্নতা দূর হয়েছে, বেহুদা ও আজে বাজে অপ্রাসংগিক কাজ কর্মের প্রতি মন আসক্তিহীন হয়ে পড়েছে, জীবনের মূল ও গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাবলীর প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ হচ্ছে।....

১৩. জামায়াতে ইসলামী শুরু থেকেই আধুনিক ইংরেজী শিক্ষিত লোক এবং মাদ্রাসায় শিক্ষাপ্রাপ্ত আলেমদের মধ্যে একটা সমন্বয় সাধন করে আসছে; একজন আধুনিক শিক্ষিত লোক যেমন দীনি ইল্‌ম থেকে বঞ্চিত থাকে, মাদ্রাসা পাশ করে যাঁরা বের হন তাঁরা আবার আধুনিক জ্ঞান লাভের কোনো সুযোগ পাননা। জামায়াতে ইসলামী একটা বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ করছে। কুরআন, হাদীস ও ফিকাহ শাস্ত্রে অভিজ্ঞ একজন আলেম জামায়াতে শরীক হওয়ার পর ইতিহাস, ভূগোল, দর্শন, সমাজবিজ্ঞান, অর্থনীতি ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করতে বাধ্য হন। ঠিক তেমনি একজন উচ্চ ডিগ্রিধারী আধুনিক শিক্ষিত লোক জামায়াতের সংস্পর্শে এসে কুরআন হাদীস এবং বিভিন্ন ইসলামী জ্ঞান লাভের সুযোগ পান এবং আন্দোলনকে সর্বস্তরের লোকের মধ্যে ব্যাপকতর করার জন্যে উভয় প্রকারের জ্ঞান অপরিহার্য। তাই বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীধারী একজন জামায়াত কর্মী যেমন ঘন্টার পর ঘন্টা কুরআন হাদীসের উপর আলোচনা

করতে পারেন, তেমনী একজন শুধু কামেল পাশ আলেম রাজনীতি ও অর্থনীতির উপরে সূধী সমাবেশে মনোজ্ঞ আলোচনা করতে পারেন। তাছাড়া পাশ্চাত্যের আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থা এবং আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞান বর্জিত মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থা শিক্ষার্থীদের মধ্যে যে দুটি বিপরীতমুখী জীবনদর্শন, রুচি ও মননশীলতা তৈরী করে-যার ফলে উভয়ের মধ্যে এক বিরাট দূরত্ব সৃষ্টি হয় এবং পারস্পরিক সম্পর্ক ছিন্ন করার কারণও হয়, জামায়াতে ইসলামী উভয়ের মধ্য সেতুবন্ধন করে দিয়েছে, উভয়ের দৃষ্টিভংগী, চিন্তাধারা, রুচি ও মননশীলতা একই খাতে প্রবাহিত করে দিয়েছে। ইসলামী আন্দোলনের জন্যে এ ছিলো এক অনিবার্য প্রয়োজন। জামায়াতে ইসলামী এ প্রয়োজন পূরণ করতে সক্ষম হয়েছে।

১৪. জামায়াতের প্রত্যেক রুকনকে [সদস্য] এ গুরুদায়িত্ব পালন করতে হয় যে, সে জামায়াতের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য, তার গঠনতন্ত্র, চারিত্রিক মান, জামায়াতের নির্ধারিত কর্মপদ্ধতির রক্ষণাবেক্ষণ করবে। যদি কখনো কোনো ব্যক্তি, ব্যক্তিবর্গ অথবা কোনো নেতা জামায়াতকে তার এ নির্ধারিত মান ও কর্মপন্থা থেকে তিল পরিমাণ বিচ্যুত করার চেষ্টা করে, তাহলে গোটা জামায়াত ও তার রুকনগণ এ ধরনের বিকৃতি ও বিচ্যুতি থেকে জামায়াতকে রক্ষা করার আপ্রাণ চেষ্টা করবে। এ উদ্দেশ্যে জামায়াতের মধ্যে আত্মসমালোচনা ও পারস্পারিক সমালোচনার স্থায়ী ব্যবস্থা আছে। জামায়াতের সর্বোচ্চ দায়িত্বশীলও এ সমালোচনার উর্ধ্বে নন।

১৫. জামায়াতের নেতৃত্ব লাভের জন্যে না কোনো প্রতিদ্বন্দ্বিতার সুযোগ আছে, আর না আকারে ইঙ্গিতে তার জন্যে ইচ্ছা প্রকাশ করা যাবে। আমীর বা অন্য কোনো দায়িত্বশীল নির্বাচনের সময় প্রত্যেক রুকন আপন চিন্তা ভাবনা অনুযায়ী কুরআন ও সুন্নাহর মাপকাঠিতে যাকে যোগ্যতম বিবেচনা করবে, গোপনে ব্যালটের মাধ্যমে তার প্রতিই তার সমর্থন জানাবে। নির্বাচনে কোনো ক্যানভাসিং নেই, কোনো গ্রুপিং নেই, কোনো হাঙ্গামা নেই। জামায়াতের নির্বাচন কমিশনার এবং ভোটার [রুকন] ব্যতীত অন্য কোনো প্রাণী ঘুর্ণাক্ষরেও জানতে পাবেনা- কিভাবে, কখন নির্বাচনী কাজ সম্পন্ন হয়।

উপরের বৈশিষ্ট্যগুলো থেকে এটাই প্রমাণিত হয় যে, জামায়াতে ইসলামী দুনিয়ায় প্রচলিত অন্যান্য দলগুলো থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ধরনের। সত্যিকার ইসলামী দলের এটাই বৈশিষ্ট্য।

জামায়াতে ইসলামী অর্থাৎ বিংশতি শতাব্দীর সত্যিকার ইসলামী আন্দোলনের অতি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস পাঠকের সামনে তুলে ধরা হলো। এ কথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, মুসলিম জাতির এমন এক পতন যুগে এ আন্দোলন শুরু করা হয়েছিলো যখন সামগ্রিকভাবে মুসলমান ঈমান আকীদাহ ও আমল আখলাকের দিক দিয়ে ইসলাম থেকে দূরে সরে পড়েছিলো। একটা শক্তিশালী চক্র রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পরিকল্পনার অধীনে মুসলমানদেরকে গোলাম বানিয়ে তাদের জাতীয় স্বাতন্ত্র মুছে ফেলার প্রচেষ্টায় লিপ্ত ছিলো। ঠিক এমনি সময়ে সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী [রঃ] ইসলামী আন্দোলনের মশাল হাতে মুসলমানদের চলার পথ আলোকিত করেন। তাদেরকে সত্য পথের সন্ধান দেন, মুসলমান হিসেবে স্বাধীনভাবে মাথা উঁচু করে বেঁচে থাকার পন্থা প্রক্রিয়া বলে দেন। ইসলাম সম্পর্কিত গতানুগতিক ভ্রান্ত ধারণা দূর করে সত্যিকার নির্ভেজাল ইসলামের সুস্পষ্ট ধারণা পেশ করেন। ইসলামকে তিনি একটি বিপ্লবী আন্দোলন, একটি জীবন্ত ও গতিশীল আদর্শ এবং মানব জাতির জন্যে একমাত্র মঙ্গলকর জীবনবিধান হিসেবে দুনিয়ার সামনে তুলে ধরে মুসলমানদের ভুলে যাওয়া সবক স্মরণ করিয়ে দেন। চিন্তাধারায় বিপ্লব সৃষ্টি করেন, মৃত জাতিকে নবজীবন দান করেন।

বিশ্বব্যাপী ইসলামী আন্দোলনের নেতৃত্ব দেয়ার সকল গুণাবলী যোগ্যতা আল্লাহ্ তায়ালা মাওলানা মওদূদীর মধ্যে দিয়েছিলেন। আজ সারা বিশ্বে ইসলামী আন্দোলনের যে জোয়ার এসেছে তা একমাত্র তাঁর ব্যক্তিত্ব এবং তাঁর প্রতিষ্ঠিত জামায়াতের অবিরাম সংগ্রামেরই ফসল।

মাওলানা মওদূদী ছিলেন সূক্ষ্মদর্শী ও দূরদর্শী আলেমে দীন। আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞানে সুপন্ডিত, সৃজনশীল চিন্তাধারার অধিনায়ক, সুদক্ষ সংগঠক, পরিচালক, সংস্কারক, সুসাহিত্যিক এবং হৃদয় জয়কারী বাগ্মী। তিনি ছিলেন

জ্ঞানের বিশ্বকোষ। তাঁর এসব গুণাবলীর জন্যে মুসলিম বিশ্ব স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাঁকে 'আল্ উস্তায্', 'আল্ ইমাম' মওদূদী নামে আখ্যায়িত করেছে। আধুনিক যুগের যতো জিজ্ঞাসা, যতো প্রশ্ন, সেসবের তিনি অকাট্য ও মনঃপূত জবাব দিয়েছেন। তিনি বিশ্ব মানবতাকে পার্থিব কল্যাণ ও পারলৌকিক মুক্তির পথ দেখিয়েছেন। হয়তো বা ভবিষ্যৎ যুগ তাঁকে বিংশ শতাব্দীর মুজাদ্দিদ নামে আখ্যায়িত করবে।

তাঁর প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত ইসলামী আন্দোলন জামায়াতে ইসলামী আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে অতি সুপরিচিত একটি সুশৃঙ্খল, সুসংহত ও শক্তিশালী সংগঠন। দুনিয়ার যেখানেই কোনো ইসলামী আন্দোলন রয়েছে তার চিন্তা ও কর্মের উৎস জামায়াতে ইসলামী, জামায়াত প্রতিষ্ঠিত মাওলানা মওদূদীর ব্যক্তিত্ব ও সাহিত্য। সমগ্র ইসলামী জগত যাঁকে ইসলামের নির্ভরযোগ্য মুখপাত্র হিসেবে মেনে নিয়েছে, তাঁর সমগ্র জীবনের সাধনার ফল জামায়াতে ইসলামী যথাসময়ে 'আলা মিনহাজির রিসালাত' অর্থাৎ খিলাফতে রাশেদার আদর্শে ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম করবেই ইনশাআল্লাহ-আমীন।

জামায়াত প্রতিষ্ঠাতার কিছু মূল্যবান কথা

দলগঠনের আবশ্যকতা

হাদীস থেকে প্রমাণিত আছে যে, জামায়াত বা দল ব্যতীত সত্যিকার ইসলামী জীবন হয়না। জীবন প্রকৃতপক্ষে ইসলামী হতে হলে সবচেয়ে প্রয়োজন যে বস্তুর, তা হচ্ছে এই যে, ইসলামের লক্ষ্য অর্থাৎ ইকামতে দীনের সাথে হতে হবে সংশ্লিষ্ট। এর দাবী হচ্ছে এই যে, এ লক্ষ্যের জন্যে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাতে হবে এবং ঐক্যবদ্ধ শক্তি ব্যতীত এ প্রচেষ্টা সম্ভব নয়। অতএব জামায়াত ব্যতিরেকে কোনো জীবনকে ইসলামী বলা মারাত্মক ভুল হবে। দ্বিতীয় কথা এই যে, কোনো ব্যক্তি আমাদের জামায়াতে শামিল না হোক। কিন্তু সে এমন জামায়াতে শামিল হোক যার লক্ষ্য এই হবে এবং যার দলীয় সংগঠন ও সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাবার পদ্ধতি ইসলামী শিক্ষা অনুযায়ী হবে। এমতাবস্থায় তাকে আমরা সত্য পথগামী পদ্ধতি স্বীকার করতে দ্বিধা করবোনা। কিন্তু ব্যক্তিগত চরিত্র গঠনের যে পদ্ধতি শরীয়তে বলা হয়েছে, কোনো ব্যক্তি শুধু তারই অনুসরণ করুক এবং ইকামতে দীনের চেষ্টা চরিত্রের জন্যে কোনো জামায়াতে শামিল না হোক-এ আমাদের কাছে ঠিক নয়। এমন জীবনকে আমরা অর্ধ জাহেলিয়াতের জীবন মনে করি। আমাদের জ্ঞান বুদ্ধিমতে ইসলামের সর্বনিম্ন দাবী এই যে, যদি কোনো ব্যক্তি তার চারপার্শ্বে ইসলামী লক্ষ্য অর্জনের জন্যে ইসলামী পদ্ধতিতে সর্বাত্মক প্রচেষ্টাকারী কোনো জামায়াতকে দেখতে না পায় তাহলে তার উচিত হবে এরূপ কোনো দল গঠনের চেষ্টা করা এবং তাকে এজন্যে প্রস্তুত থাকতে হবে যে, যখনই এ ধরনের কোনো জামায়াত পাওয়া যাবে, তখন তার সকল আমিত্ব বিসর্জন দিয়ে জামায়াতের মনোভাব নিয়ে তাতে শামিল হতে হবে। [রাসায়েল ও মাসায়েল]

তাবলীগ ও বিপ্লব

আপনার পত্র থেকে যতটুকু বুঝতে পেরেছি তার মর্ম হলো এই যে, বর্তমান সময়ে শুধু মৌখিক তাবলীগ, বক্তৃতা, প্রবন্ধ লিখন ও পত্রপত্রিকার দ্বারা প্রচার চালানো হোক। এর উপরে না নিজের কোনো আমল করার দাওয়াত দেওয়ার প্রয়োজন আছে। তারপর যখন সকল মুসলমানের মন-মস্তিষ্ক আমাদের ভাবধারার প্রভাবিত হবে, তখন হঠাৎ একদিন বিপ্লব ঘটবে।

ধারাণাটি তো বেশ চমৎকার! কিন্তু তাবলীগ এবং বিপ্লবের প্রকৃতি যে এক নয় তার কি করা যাবে? প্রভাবশীল ও কার্যকরী তাবলীগ কেবলমাত্র তখনই হতে পারে যখন তাবলীগকারী দল তার নীতির উপর আমল করবে এবং এর উপরে আমলকারীদেরকে সংগঠিত করবে। শুধু ওয়াজ নছিহত বহুদিন ধরে চলে আসছে। তার কি ফল হয়েছে? [রাসায়েল ও মাসায়েল]

ইকামতে দীন একটি অটল ও অপরিহার্য কর্তব্য

প্রত্যেক সত্যানুসন্ধী ব্যক্তির অপরিহার্য কর্তব্য এই যে, সে যেন তার মধ্যে ইকামতে দীনের তীব্র অনুপ্রেরণা সৃষ্টি করে। অতঃপর সে চেষ্টা করবে যাতে করে তার মনের মধ্যে এ আগুন জ্বলে উঠে। এ চেষ্টা-চরিত্রের পরিণাম কি হবে, তা আলোচনা বহির্ভূত। এমনও হতে পারে যে, আমাদেরকে করাত দিয়ে চিরা হবে মাটির উপর দিয়ে টেনে-হেঁচরে নেয়া হবে, জ্বলন্ত কয়লার উপরে নিক্ষিপ্ত করা হবে এবং আমাদের মৃতদেহ কাক-চিলের খাদ্য হবে। এতসব করেও হয়তো আমাদের এ সৌভাগ্য হবে না যে, বর্তমান বাতেল ব্যবস্থাকে আমরা একটা সত্যসুন্দর ব্যবস্থায় পরিবর্তিত করতে পারবো। কিন্তু এ ব্যর্থতা কোনো ব্যর্থতা নয়। ব্যর্থতার কোনো আশংকা বরঞ্চ নিশ্চয়তা আমাদেরকে ঐ দাবী থেকে মুক্তিদান করবে না, যে দাবী ইকামতে দীনের আল্লাহ্ তায়ালা করেছেন। এ একটা অটল অপরিহার্য কর্তব্য যা আমাদেরকে যে কোনো মূল্যে যে কোনো অবস্থায় পালন করতে হবে। যদি সকল খানকাহ্গুলি আপনাদেরকে এ আশ্বাস দেবার চেষ্টা করে যে, অমুক অমুক অজিফা-তফজফ্ এ দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দিতে পারে, তাহলে আমি আপনাদেরকে নিশ্চয়তার সঙ্গে

বলব যে, এ শয়তানী প্রবঞ্চনা মাত্র। যতক্ষণ পর্যন্ত আপনাদের ঘাড়ে মাথা রয়েছে আর আল্লাহ্র দীনের প্রাসাদের একখানা ইটও তার স্থান থেকে বিচ্যুত হয়ে আছে এবং আল্লাহ্র পৃথিবীর সূচাগ্রভূমি আল্লাহ ব্যতীত অপরের দাসত্বে নত হয়ে আছে, ততক্ষণ আপনাদের জন্যে শান্তির নিদ্রা হারাম। [জামায়াতে ইসলামীর কার্যবিবরণী –৩য় খন্ড]

হুকুমতে ইলাহীয়া ও আল্লাহ্র সন্তুষ্টি

ইকামতে দীনের এ প্রচেষ্টা সম্পর্কে কিছু বলতে পারি না যে, এর ফলাফল কি হবে? পরিণাম ফল তো আল্লাহ্ তায়ালাই জানেন। এ প্রচেষ্টার ফল যদি এ হয় যে, আমরা একটা সৎ সমাজ ব্যবস্থা কায়েম করতে সক্ষম হয়েছি, তাহলে তা হবে আল্লাহ্র দান। কিছুসংখ্যক লোক ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ করে এ কথা বলে যে, আমাদের সকল প্রচেষ্টা ক্ষমতা লাভের জন্যে এবং দীনের আসল উদ্দেশ্য যে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভ, তা আমাদের মধ্যে নেই। তাদের এ ধারণা একেবারে ভ্রান্ত। আমাদের সকল প্রচেষ্টা একটা সৎ এবং খোদায়ী ব্যবস্থার জন্যে। এ প্রচেষ্টায় কোনো অপরাধ নেই এবং এতে লজ্জারও কিছু নেই। আমরা যখন হুকুমতে এলাহীয়ার নাম করি তখন আমরা উপরোক্ত ব্যবস্থাকেই বুঝাই। আমি বুঝতে পারি না যে, এটা আমাদের আকাংখিত হলে, এতে বিতর্কের কি আছে? এবং এটা খোদার সন্তুষ্টি কামনার পরিপন্থীই বা কি করে হবে? খোদার পৃথিবীতে একমাত্র খোদারই বিধান চলবে–এর চেয়ে অধিক খোদার সন্তুষ্টি কামনাকারী আর কে হতে পারে? যারা এ কাজের জন্যে জান-মাল ত্যাগ করে এবং ফলাফল যাই হোক না কেন? খোদার পৃথিবীতে খোদা ছাড়া কারো প্রভূত্ব কিছুতেই চলতে দিতে চায় না এ ধরণের সংগ্রাম প্রচেষ্টা যদি দুনিয়াদারী হয়, তবে দীনদারী কি একে বলে–যে রাত্রি জেগে জেগে আল্লাহ্, আল্লাহ্, যেকের করা হবে, আর দিনের বেলায় শয়তানের সিংহাসন প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করা হবে? যারা এ ধরণের কথা বলে, তাদের মন-মস্তিষ্কে দীন সম্পর্কে অতি নিকৃষ্ট ধারণা রয়েছে। [জামায়াতে ইসলামীর কার্য বিবরণী–৩য় খন্ড]

সত্য পথের দাবী

এ পথের দাবী এই যে, আমাদের মধ্যে যেন বিরোধিতাকে স্বাগত জানাবার অনুরাগ সৃষ্টি হয়। সত্য পথেই হোক আর ভ্রান্ত পথেই হোক আল্লাহ্ তায়ালার নীতি এই, যে ব্যক্তি যে পথই অবলম্বন করে, সে পথেই তার অগ্নিপরীক্ষা হয়। হক পথের তো বৈশিষ্ট্যই এইযে, প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত এ অগ্নিপরীক্ষায় পরিপূর্ণ। যেমন অংক শাস্ত্রের কোনো মেধাবী ছাত্র কঠিন প্রশ্নে সন্তুষ্ট হয় এ জন্যে যে, তার মেধাশক্তির পরীক্ষার সুযোগ এসেছে। ঠিক এরূপ কোনো দৃঢ় সংকল্প মুমিন কোনো নতুন পরীক্ষার সম্মুখীন হতে আনন্দ পায় এ জন্যে যে, তার আনুগত্য প্রমাণ করার সুযোগ এসেছে। ক্ষীণ প্রদীপ বাতাসের ঝাপটায় নিভে যায়, কিন্তু প্রজ্জ্বলিত উনুনকে বাতাসের ঝাপ্‌টা আরো অধিকতর প্রজ্জ্বলিত করে দেয়। আপনার নিজেদের ভিতরে এমন যোগ্যতা সৃষ্টি করুন যে, যেভাবে একটা প্রজ্জ্বলিত উনুন সিক্ত জ্বালানীর দ্বারা নিভে না গিয়ে বরং তাকে তার খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করে, তেমনি আপনারা বিরোধীতার কাছে নত না হয়ে বরং তা থেকে খাদ্য এবং শক্তি সংগ্রহ করুন। যতদিন না এ যোগ্যতা আমাদের মধ্যে পয়দা হয়েছে ততদিন এ আশা করা যেতে পারে না যে, আমাদের দ্বারা দীনের কোনো ভালো খেদমত হতে পারে। [জামায়াতে ইসলামীর কার্যবিবরণী–৩য় খন্ড]

❖❖❖

গ্রন্থপঞ্জী

১. মাসিক তর্জুমানুল কুরআন-
২. তাহ্‌রিকে আযাদীয়ে হিন্দ্ আওর মুসলমান-
[সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী]
৩. সাইয়েদ মওদূদী কা আ্হদ- সাইয়েদ নকী আলী
৪. জামায়াতে ইসলামীর কার্য বিবরণী -[কয়েক খন্ড]
৫. জামায়াত ইসলামী – নঈম সিদ্দীকি
৬. জামায়াতে ইসলামীর উনত্রিশ বছর
৭. চেরাগে রাহ্-ইসলামী আন্দোলন সংখ্যা
৮. সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী ; – আবুল আফাক
৯. মাওলানা মওদূদী-[মৎপ্রণীত]
১০. তারীখে-জামায়াতে ইসলামী – আসাদ গিলানী
১১. ও অন্যান্য সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্রিকাসমূহ।

সমাপ্ত

শতাব্দী প্রকাশনীর সেরা বই

ফিকহুস্ সুন্নাহ্ ১ম, ২য়, ৩য় খণ্ড
রাসায়েল ও মাসায়েল (১-৭ খণ্ড)
Let Us Be Muslims
ইসলামী রাষ্ট্র ও সংবিধান
ইসলামী জীবন ব্যবস্থার মৌলিক রূপরেখা
ইসলামী দাওয়াত ও তার দাবি
সুন্নাতে রসূলের আইনগত মর্যাদা
ইসলামী অর্থনীতি
আল কুরআনের অর্থনৈতিক নীতিমালা
ইসলাম ও পাশ্চাত্য সভ্যতার দ্বন্দ্ব
ইসলামে মৌলিক মানবাধিকার
কুরআনের দেশে মাওলানা মওদূদী
কুরআনের মর্মকথা
সীরাতে রসূলের পয়গাম
সীরাতে সরওয়ারে আলম (৩-৫ খণ্ড)
সাহাবায়ে কিরামের মর্যাদা
আন্দোলন সংগঠন কর্মী
ইসলামী আন্দোলনের সঠিক কর্মপন্থা
ইসলামী বিপ্লবের পথ
ইসলামী দাওয়াতের দার্শনিক ভিত্তি
জাতীয় ঐক্য ও গণতন্ত্রের ভিত্তি
ইসলামী আইন
আধুনিক নারী ও ইসলামী শরীয়ত
গীবত এক ঘৃণিত অপরাধ
ইসলামী ইবাদতের মর্মকথা
ইসলামী শরিয়া: মূলনীতি বিভ্রান্তি ও সঠিক পথ
আধুনিক বিশ্বে ইসলাম
আধুনিক বিশ্বে ইসলামী জাগরণ ও মাওলানা মওদূদীর চিন্তাধারার প্রভাব
মাওলানা মওদূদী ও তাসাউফ
জামায়াতে ইসলামীর উদ্দেশ্য ইতিহাস কর্মসূচী
যুগ জিজ্ঞাসার জবাব ১ম খণ্ড
আল্লাহর নৈকট্য লাভের উপায়
দাওয়াতে দীনের গুরুত্ব ও কৌশল
কুরআন রমজান তাকওয়া
ইসলামের পুনরুজ্জীবনে মাওলানা মওদূদীর অবদান
Political Thoughts of Maulana Maudoodi
মানবতার বন্ধু মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ সা.
নারী অধিকার বিভ্রান্তি ও ইসলাম
ইসলামী আন্দোলন অগ্রযাত্রার প্রাণশক্তি
জামায়াতে ইসলামীর ইতিহাস (সংক্ষিপ্ত)
মাওলানা মওদূদীর বহুমুখী অবদান
আলেমে দীন মাওলানা মওদূদী
ইসলামী আন্দোলন: বিশ্ব পরিস্থিতির উপর তার সাফল্য
নতুন শতাব্দীতে নতুন বিপ্লবের পদধ্বনি
আধুনিক বিশ্বের চ্যালেঞ্জ ও ইসলাম

কুরআন পড়বেন কেন কিভাবে?
আল কুরআন আত্ তাফসির
কুরআনের সাথে পথ চলা
জানার জন্য কুরআন মানার জন্য কুরআন
কুরআন বুঝার প্রথম পাঠ
কুরআন বুঝার পথ ও পাথেয়
কুরআন পড়ো জীবন গড়ো
আল কুরআনের দু'আ
কুরআন ও পরিবার
ইসলামের পারিবারিক জীবন
সিহাহ সিত্তার হাদীসে কুদ্সী
হাদিসে রসূল সুন্নতে রসূল
হাদিসে রসূলে তাওহীদ রিসালাত আখিরাত
আদর্শ নেতা মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ সা.
আসুন আমরা মুসলিম হই
শিক্ষা সাহিত্য সংস্কৃতি
মুক্তির পথ ইসলাম
গুনাহ তাওবা ক্ষমা
যাকাত সাওম ইতিকাফ
আপনার প্রচেষ্টার লক্ষ্য দুনিয়া না আখিরাত?
কুরআন হাদীসের আলোকে শিক্ষা ও জ্ঞান চর্চা
ইসলামি শরিয়া কি? কেন? কিভাবে?
বাংলাদেশে ইসলামী শিক্ষানীতির রূপরেখা
ঈদুল ফিতর ঈদুল আযহা
আধুনিক বিশ্বে ইসলামী আন্দোলন ও মাও.মওদূদী
মানুষের চিরশত্রু শয়তান
যিকির দোয়া ইস্তিগফার
ঈমান ও আমলে সালেহ্
ইসলামী অর্থনীতিতে উপার্জন ও ব্যয়ের নীতিমালা
হাদীস পড়ো জীবন গড়ো
সবার আগে নিজেকে গড়ো
এসো জানি নবীর বাণী
এসো এক আল্লাহর দাসত্ব করি
এসো চলি আল্লাহর পথে
এসো নামায পড়ি
নবীদের সংগ্রামী জীবন ১ম ও ২য় খণ্ড
সুন্দর বলুন সুন্দর লিখুন
বিপ্লব হে বিপ্লব (কবিতা)
আল্লাহর রসূল কিভাবে নামায পড়তেন?-অনূদিত
ইসলামী বিপ্লবের সংগ্রাম ও নারী-অনূদিত
রসূলুল্লাহর বিচার ব্যবস্থা-অনূদিত
ইসলাম আপনার কাছে কি চায়?-অনূদিত
ইসলামের জীবন চিত্র-অনূদিত
যাদে রাহ্-অনূদিত

শতাব্দী প্রকাশনী
৪৯১/১ মগবাজার ওয়ারলেস রেলগেইট
ঢাকা-১২১৭, ফোনঃ ৮৩১১২৯২, ০১৭৫৩ ৪২২২৯৬
E-mail : Shotabdipro@yahoo.com